# কুরুবকের দেশে

বুদ্ধদেব গুহ

# কুরুবকের দেশে

(নতুন ঋজুদা কাহিনি)

বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ
তসলিমা নাসরিন
কল্যাণীয়াসু

# কুরুবকের দেশে

আমি, ভটকাই আর তিতির ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোড-এর ফ্ল্যাটে বসেছিলাম। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গদাধরদা আমাদের চিঁড়ে-কড়াইশুঁটির সঙ্গে চিনাবাদাম আর ধনেপাতা দিয়ে একটা গদাধরী—স্পেশালিটি বানিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে 'আবার খাবো' সন্দেশ আর শোনপাপড়ি। দার্জিলিং থেকে আনানো লপচু চা ভেজানো হয়ে গেছে। তারই খুশবু ভেসে আসছে খাওয়ার ঘর থেকে। টি-কোজি মুড়ে জাপানি চা-এর পট আর জাপানি পেয়ালা পিরিচ সব নিয়ে আসবে গদাধরদা ট্রেতে সাজিয়ে একটু পরেই। আসলে, আজকে জাপানের কোবে থেকে নিকিটা সান-এর ক্যুরিয়ারে পাঠানো ওই চায়ের সেটটার ইনোগরেশ্‌নের জন্যই আমাদের আসা। আমরা কেউই জানতাম না যে ইংরেজি 'মিস্টার', জার্মান 'হেরর', ফরাসি 'মঁসিয়ে' যেমন ওদেশীয় মানুষদের নামের আগে ব্যবহার করতে হয়, তেমনই জাপানি সম্ভাষণেও 'সান' শব্দটা পুরুষদের নামের পরে ব্যবহার করতে হয়। ঋজুদা নিকিটা সান-এর বাড়িতে ওসাকাতে দেড়মাস

ছিল। সেই বাড়ির স্বপ্নের মতো বাগান, টাটামি-ফ্লোর, অভাবনীয় আতিথেয়তা এবং আরও নানা কিছুর গল্প আমরা শুনেছি ঋজুদা ফিরে আসার পরে বহুদিন, ঋজুদার কাছ থেকে। ভটকাই সবচেয়ে মজা পেয়েছে ধন্যবাদ এর জাপানি ভার্সান শুনে। জাপানিরা ধন্যবাদ দেয় 'দোমো আরিগাতোঁ ওদাইমাস্তা' বলে কাঁধ ঝুঁকিয়ে। অবশ্য আজকের দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিমানবন্দরের ঘোষণাতে এবং অন্যত্রও ওরা 'দোমো আরিগাতোঁ ওদাইমাস্তাকে' সংক্ষেপ করে শুধু 'ওদাইমাস' বলেই চালায়।

ভটকাই একবার ঘড়ি দেখল। এমন কখনওই হয় না। ঋজুদা সাত মিনিট লেট। একটা ঘটনার মতো ঘটনা বটে। ঠিক সেই সময়েই ফোনটাও বাজল। ল্যান্ড লাইনের ফোন। ভটকাই-ই ফোনটা তুলল। এক মিনিট কথা হল। তারপর ভটকাই ফোন নামিয়ে রেখে বলল, ঋজু সান।

কি বলল ঋজুকাকা তাই বলো না।

বিরক্ত গলাতে তিতির বলল।

কি আর বলবে। বলল, সরি।

ওড়িশার সম্বলপুর থেকে আসা মহানদী কোলফিল্ডস-এর টেকনিকাল ডিরেক্টর মিস্টার বিশ্বলের কাছে গিয়ে আটকে গেছে। তবে তাজ-বেঙ্গল-এ আছে। এখুনি এসে পড়বে। তাজ থেকে বিশপ লেফ্রয় রোড তো ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব বলতে গেলে। এলে, শুধু খাওয়া দাওয়াই নয়, অন্য কথাও হবে। তারপর একটু দম নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, ঋজুদার গলার স্বর শুনে মনে হল, বুঝলি, সামথিং ইজ হ্যাচিং।

আমাদের যেতে হতে পারে কোথাও, মানে...

আহা! তুমি ঋজুদার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝে গেলে! অন্তর্যামী একেবারে।

তিতির বলল, ইয়েস! সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে বুঝেছো। হুঁ!

তাচ্ছিল্যের গলাতে বলল তিতির।

কোথায়? মানে যেতে হতে পারে কোথায়?

তিতিরই বলল।

তা কী করে বলব?

শনৈঃ শনৈঃ নিজেরাই জানতে পারবে। তবে মনে হচ্ছে হয়তো সম্বলপুরেই।

তিতির বলল।

জায়গাটার নাম কি সম্বলপুর না কম্বলপুর? ভটকাই স্বগতোক্তি করল, চিঁড়ে ভাজা চিবোতে চিবোতে।

আমি বললাম, সম্বলপুরের নাম ভুলে গেলি? ওড়িশার সব চেয়ে বড় নদী মহানদীর পারে মস্ত বড় তীর্থস্থান। মা সমলেশ্বরীর মন্দির আছে সেখানে। মন্দির, চত্বর সবই সাদা-রঙা। প্রচণ্ড জাগ্রত দেবী। কটকের মা কটক-চণ্ডী আর সম্বলপুরের মা সমলেশ্বরী। তুই কী রে। ঋজুদার মুখে শোনা জুজুমারার বাঘের গল্পও ভুলেই গেলি। এত কষ্ট করে এক একটা লেখা লিখি আর...

হ্যাঁ। হ্যাঁ। মনে পড়েছে। সরি রুদ্র। ঋজুদার সঙ্গেই তো গিয়েছিলাম একবার।

আমি বললাম, এই দুই দেবীই কিন্তু একই। মা দুর্গার যে কত নাম। দুজনেই মা দুর্গা।

তিতির বলল, ওই দুর্গাকেই উত্তরপ্রদেশের কাছের বিন্ধ্য-পাহাড়ে বলে, 'বিন্ধ্যবাসিনী'। আবার শিবাজী মহারাজ এবং মারাঠারা এঁকেই মা ভবানী বলেন! পুণা শহরের বুকেই একটি টিলার উপরে ভবানী মন্দির আছে। আরও কত নাম আছে।

গম্ভীর গলাতে ভটকাই বলল, তাহলে ভাঁড়ে মা ভবানী কোনও দেবী?

হাসির দমকে তিতিরের গলাতে চিঁড়ে ভাজা আটকে গেল। আমিও জোরে হেসে উঠলাম।

ভটকাইও হাসছিল, তবে না হেসে।

আমাদের হাসি থামলে ভটকাই বলল, না ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ইয়ার্কি

করা ভাল নয়। তাও আমাদের সবই সহ্য হয়। ইসলামে এসব বাঁদরামো সহনীয় নয়। মুসলমান হলে তোরা এতক্ষণে হয়তো আমাকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে কোতলই করে দিতিস।

—সে পাকিস্তানি বা ইরানি বা আফগানি হলে। বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের বিশেষ তফাৎ নেই। তিতির বলল।

তারপর বলল, শিক্ষাই মানুষকে ঔদার্য দেয়। বাঙালি মুসলমানেরা তো আর মাদ্রাসার শিক্ষাতে আটকে থাকেননি। আসল দোষ হচ্ছে ধর্মান্ধতা। তিনি বা তাঁরা যে জাতের মানুষই হন না কেন! দাদুর কাছে শুনেছি, ওঁদের ছেলেবেলাতে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই দুর্দান্ত আরবী-ফারসি জানতেন। আবার তেমন শিক্ষিত মুসলমানেরাও সংস্কৃত জানতেন। ওই ইংরেজরাই এসে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট করে চাকরের জাত বানিয়ে দিয়ে গেল। সাহেব বানালো। তাও পুরো সাহেব বানালেও বুঝতাম। ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতিতে সামিল করল আমাদের।

—স্বাধীনতার পরে তো আমরা আরও বড় সাহেব হয়েছি। দক্ষিণ কলকাতার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা তো বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি সবই ত্যাগ করেছে। বাংলা গান, বাঙালি পোষাক, বাংলা সাহিত্য। নইলে রুদ্রর ঋজুদা কাহিনীগুলো ফেলে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা ফেলে, এমনকি বিভূতিভূষণের লেখাও ফেলে ওরা হ্যারী পটার আর বাংলা ব্যান্ডের গান নিয়ে নাচানাচি করে? রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, আমাদের কীর্তন, বাউল, নজরুল সবই ফেলে দিল! কত বড় গণ্ডমূর্খ ওরা, তাই ভাবি।

তিতির বলল।

তারপর বলল, কোনও কোনও মিডিয়ারও কিছু কম ভূমিকা নেই বাঙালি জাতির এই অধঃপতনের পিছনে। বাঙালির যা কিছু ভাল সবই নির্মূল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন এঁরা। ওঁদের একমাত্র প্রার্থনা টাকা, আরও টাকা। আর কত টাকার দরকার ওঁদের? ব্যবসা বাংলা ভাষা নিয়ে, এদিকে ছেলে মেয়ের জন্যে আমেরিকান বউ আর জামাই ছাড়া জুটল না।

আমি বললাম, ওরা গণ্ডমূর্খ? না এদের মা-বাবারা? মা-বাবারা যা শেখাবে তাই তো শিখবে। আমরা তো আমাদের মধ্যে যা কিছু গভীর বা ভালো, সব আমাদের মা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি।

তিতির বলল, টাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত বল কী হয়?

ভটকাই বলল, কেন? রাহুল মহাজন হয়।

এই সব বাঙালি মিডিয়ার পরের প্রজন্মেও সম্ভবত ওইরকমই হবে।

ভটকাই গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, ওসব নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা করার সময় হয়েছে। এটা সত্যিই যে আমাদের ওয়েল-অফ বাঙালি ছেলেমেয়ের মধ্যে কেরিয়ার, টাকা ও সব ছাড়া প্রার্থনার আজ আর কিছুমাত্রই নেই। এখনকার ছেলেমেয়েরা যতই টাকা-পয়সা রোজগার করুক না কেন, সংস্কৃতি-সঙ্গীত-সাহিত্য-মনুষ্যত্ব এসব ক্ষেত্রে এরা সব দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। ক্রমশই হয়ে যাচ্ছে। কত বড় নিঃস্ব যে হয়ে যাচ্ছি আমরা, তা বোঝার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই আমাদের। যে জাত নিজের মাতৃভাষা, নিজের সাহিত্য, নিজের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয় তারা মানুষই নয়।

আমি বললাম, ঋজুদা বলে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পূর্ণ-মনুষ্যত্বের দিশা দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন খণ্ড-মানুষ না হতে।

—খণ্ড মানুষতো দূরস্থান, আমরা অপোগণ্ডই হলাম সব।

ভটকাই বলল।

এমন সময়ে দরজার বেলটা বাজল। থুড়ি, 'কলিং-এর ঘণ্টা'।

দরজা খুলতেই দেখি একটি প্রৌঢ় লোক দাঁড়িয়ে। হাতে প্লাস্টিকের একটি প্যাকেট আধময়লা ধুতি আর ফতুয়া পরা। অবাকই হলাম। আজকাল ধুতিপরা বাঙালি আর দেখাই যায় না।

—কোথা থেকে?

জিজ্ঞেস করলাম।

—যদুবাবুর বাজার থেকে। ঋজুবাবু কচি পাঁঠার মাংস পৌঁছে দিয়ে

যেতে বলে দিয়েছেন ফোনে। দেড় কেজি মাংস নিয়ে এসেছি। পাঁঠাটা একেবারে কচি ছিল—চার কেজি মতো।

ভটকাই এগিয়ে এসে বলল, কি হবে এ দিয়ে? মানে, কি রান্না হবে?

—আপনি কি ঋজুবাবু?

ভটকাই বেদম চটে গিয়ে বলল, দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

—আজ্ঞে, আমি তো আগে তাকে দেখিনি কখনও।

—তা তো বুঝতেই পারছি। বলেই, গলা তুলে ডাকল, গদাধরদা।

গদাধরদা ভিতর থেকে এসে বলল, কী হল? আমি ভাবনু এ ঘরে আগুনই নেগেছে বুজি।

—হ্যাঁ। তোমার কপালে আগুন। এই যে ইনি যদুবাবুর বাজার থেকে কচি পাঁঠার মাংস নিয়ে এসেছেন, ঋজুদা নাকি ফোন করে বলে দিয়েছে।

গদাধরদাকে দেখেই আগন্তুক বললেন, ওঃ। বড়দা। নমস্কার। আপনিই যে গদাধরবাবু তা জানব কেমন করে। আমরা সবাই তো গত পঁচিশ বছর ধরে আপনাকে ব্লড়দা বলেই জানি।

—তা তোমরা সকলেই তো চিরদিনই ছোড়দাই থাকবে—দাড়ি পেকে গেলেও। সবাই মিলে আমাকে বড়দা বানালে আমি কী করব!

আগন্তুক বলল, বাবু, বড়বাবুকে ফোন করে দিয়েছিলেন। দিয়ে গেলাম।

—কি হবে এ দিয়ে? পটু?

গদাধরদা বলল।

—তা তো আমি জানি না। নিতান্ত অপটুর মতো বলল আগন্তুক পটু। তারপর বলল, বাবু এসেই বলবেন হয়তো।

ঠিক আছে।

চলি। পটুবাবু বললেন।

গদাধরদা বলল, যাবে কি? এই পেথমবার এইলে, বোসো, দুটি মিষ্টি আর একটু সরবৎ খেইয়ে যাও। তোমাদের দোকানে গেইলেই আমাকে যে কত চা-পান খাওয়াও তোমরা! ঋজুবাবু জাইনলে আমাকে বরখাস্তই

কইরে দেবেন।

আমরা সকলেই একসঙ্গে বললাম, সত্যিই তো! শুধু মুখে চলে যেতে দিলে তো আপনাকে আমরা। কিন্তু হাতে প্লাসটিক-এর ব্যাগ কেন? পরিবেশ দূষিত করবেন না।

গদাধরদা ট্রেতে সাজিয়ে মিষ্টি আর পেয়ারার জ্যুস নিয়ে এসে পটুবাবুকে দিতে না দিতে আবার বেল বাজল। দরজা খুলতেই ঋজুদা ঢুকেই বলল, বাঃ। গদাধরদা তোমার তো বুদ্ধি খুলে গেছে দেখছি। তুমি যে এঁকে শুধু মুখে ফেরৎ পাঠাওনি দেখে খুবই ভাল লাগছে।

গদাধরদাও সোজা পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপ্যায়ন আমি কি আমার নিজের বুদ্ধিতে করেছি। তোমার চেলা-চামুণ্ডারাই না এই বুদ্ধিটি যোগালো। আমি মুখ্য-সুখ্যু গেঁয়ো মানুষ, আমার কি ভদ্রতা-সভ্যতা সহবৎ জ্ঞান আছে। এঁরা সবাই নেকা-পড়া করা ভদ্দরনোক।

আমরা মাথা নীচু করে চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা বলল, বাঃ। দারুণ গন্ধ ছেড়েছে তো লপচু চা-এর। মানজিৎ সিং পাঠায় আমাকে প্রতি মাসে দার্জিলিং থেকে।

—কে মানজিৎ সিং?

তিতির শুধোল।

—সর্দার মানজিৎ সিং মান। দার্জিলিং-এর ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। খুব বড় পরিবারের শিখ। অতি চমৎকার ছেলে। তবে বড্ড মদ খায়। মদ খেয়েই যদি মরে না যায় তবে খুব উন্নতি করবে জীবনে। এই মদ খাওয়ার ব্যাপারে আমার শিকারী বন্ধু ডুয়ার্স-এর সামসিং টি-এস্টেটের ম্যানেজার উই ম্যাকেঞ্জির মতোই ও। উই তো মদ খেয়ে মরেই গেল।

—মানুষের নাম উই? সে কি পোকা ছিল না কি? না কি তার নাকে-কানে পোকা ছিল?

ভটকাই ভটকাইসুলভ একটা প্রশ্ন করল।

—তুই একটি গর্দভ। উই মানে, Wee। ইংরেজিতে Wee শব্দের মানে

Small। বাগরাকোটের চা-বাগানের ম্যানেজারও ছিল আরেক ম্যাকেঞ্জি। দুজনেই স্কটল্যান্ডের লোক। তবে ডনাল্ড ছিল ছ ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা আর দানবের মতো দেখতে। দারুণ শিকারী ছিল। পায়ে হেঁটে বাঘ মারত। হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড-এর পয়েন্ট ৩৭৫ ডাবল ব্যারেল রাইফেল ছিল ওর একটা। দু চোখ খুলে মাস্টার-আই দিয়ে মারত। আমাকেও মাস্টার-আই দিয়ে গুলি করতে শিখিয়েছিল ডনাল্ড। আর রনাল্ড রস ম্যাকেঞ্জি ছিল বেঁটে-মোটা গাঁট্টা-গোঁট্টা। তবে আমাদের তুলনাতে বেঁটে নয়, সাহেবদের তুলনাতে বেঁটে। দুই ম্যাকেঞ্জির মধ্যে রনাল্ড ম্যাকেঞ্জি ছোটখাটো ছিল বলেই অন্যান্য সাহেব ম্যানেজাররা তাকে Wee MAC বলে ডাকত। ডনাল্ডকে অবশ্য ডনাল্ডই বলত। উই বিয়ে করেনি, হি ডায়েড ভেরি ইয়াং অ্যান্ড আ ব্যাচেলর। কিন্তু ডনাল্ড বিয়ে করেছিল। আর তার বউ 'বেটি' ছিল অপরূপ সুন্দরী। যে-কোনও ইংরেজ অভিনেত্রীর চেয়েও সুন্দরী।

পটুবাবু খাবেন কি, হাঁ করে ঋজুদার গল্প শুনছিলেন। ওঁর খাওয়া হলে, পেয়ারার জ্যুস খেয়ে উনি বললেন, আজ তাহলে উটি?

—ঋজুদা বলল, টাকাটা? মাংসের দাম?

—সে সব আমার বাবু আর বড়দা জানে। বড়দার তো অ্যাকাউন্ট আছে। মাঝে মাঝে থোক টাকা দিয়ে দেন তো বড়দা।

—সে কি? বলেনি তো কখনও গদাধরদা আমাকে। আমি হঠাৎ মারা গেলে কি তোমার জন্যে স্বর্গের গেটে আটকে যাব? নরকবাস হবে আমার? না, না, ধার রাখা আমি একদম পছন্দ করি না। এরকম কোরও না গদাধরদা। তোমাকে কি আমি টাকা দিই না, না তোমার আঙুলে গেঁটেবাত আছে যে টাকাটা ওঁদের দিয়ে দিতে পার না?

গদাধরদাও দোকনো-পণ্ডিত। অনেক ঋজু বোসকে চরিয়ে খেতে পারে।

সে বলল, ধার তো রাখি না। অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে রাখি। বালাইষাট! তুমি মরতে যাবে কেন? তবে যদি কোনও সময় মরো, তবে

তোমার স্বর্গে যাওয়ার পথ একেবারে পাকা করাই আছে।

ঋজুদা হেসে বলল, তুমিই জানো। এবার চা টা দাও দয়া করে। আর সঙ্গে আর কি দেবে—যা ওদের দিয়েছ। চা'টা তো কড়া হয়ে গেল। ঠাণ্ডাও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এতক্ষণে।

—ঠিক আছে। ও চা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে ভিজোচ্ছি। তোমার কথার তোড়েই তো চা কড়া হয়ে গেল। যত্তসব আপ্পোজনীয় কথা। গুচ্ছের সায়েবের কথা জেনে আমরা করব কি?

ঋজুদা দোষ স্বীকার করে বলল, সেটা ঠিকই। অকারণ আমি বড় বেশি কথা বলি। বয়স হচ্ছে তো। বুঝলে না গদাধরদা, তোমার দোষে ধরেছে।

গদাধরদা ঋজুদাকে চিঁড়ে ভাজা দিতে এলে ঋজুদা বলল, মাংস দিয়ে খিচুড়ি রাঁধো গদাধরদা—বৃষ্টি নেমেছে দেখছো না? এ বছর একদিনও তো ইলিশ মাছ খাওয়া হল না। এক কেজি সওয়া কেজির ইলিশ, তার উপর স্বাদও নেই। এ কি খাদ্যের মধ্যে গণ্য?

—না! এবারে নিজেরই যেতে হবে একদিন বাজারে। নিজেরই যেতে হবে ইলিশ-অভিযানে।

—আর কি করব সঙ্গে? মানে, মাংস-দেওয়া খিচুড়ির সঙ্গে?

—কড়কড়ে করে আলুভাজা, বেশি করে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পেঁয়াজি আর আমের আচার।

আমি বললাম, মাংস দিয়ে খিচুড়ির কথা শুনলেই আফ্রিকার 'উগালির' কথা মনে পড়ে যায়, তাই না ঋজুদা?

—যা বলেছিস। তিতিরও তো খেয়েছিস উগালি রুআহাতে গিয়ে।

বলেই বলল, গদাধরদা তো আনছে চা। এবারে বলো তো বিশ্বল সাহেবের সঙ্গে তোমার কি কাজ ছিল? ভটকাই তো তোমার ফোন পাবার পর থেকেই বলছে যে ওর 'মন বলছে' সামথিং ইজ হ্যাচিং।

ঋজুদা হেসে ফেলল তিতিরের কথা শুনে। বলল, তাই? তোরা দেখি আমারই উপরে গোয়েন্দাগিরি শুরু করলি।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

একটু পরে চায়ের কাপ-এ ও চুমুক দিয়ে ঋজুদা বলল, ভটকাই-এর অনুমানটা ঠিকই। তবে আমি প্রথমে রাজি হয়নি। এখনও কথাও দিইনি যাব বলে। ফাইনাল কথা কাল বিকেলে দেব। কিন্তু এই বিশ্বলের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। যখন ও ওড়িশা ম্যাঙ্গানিজ করপোরেশানে ছিল তখন থেকে। তাই শেষ পর্যন্ত 'না' করা যাবে না হয়তো। যদি যেতেই হয় তবে, আগামী সপ্তাহেই আমাদের বামরা যেতে হবে।

—বামরা? সে আবার কোথায়?

—ওড়িশাতেই। ওড়িশার একটি করদ-রাজ্য ছিল এক সময়ে। সুন্দরগড়ের কাছেই। সম্বলপুরেরও কাছে। ওড়িশাতে কত যে করদ রাজ্য ছিল, তা বলার নয়।

—সেটা আবার কোথায়? সুন্দরগড়?

ভটকাই শুধোল।

তিতির হেসে বলল, বামরার কাছেই। মালকাজান বাইজি যেমন করে এক মশহুর ওস্তাদকে বলেছিলেন, "কলকাতা থেকে বেনারস যতদূর, বেনারস থেকে কলকাতাও ঠিক ততদূরই"। তেমনই ব্যাপার আর কী।

—তুমি গিয়েছ আগে কখনও? ঋজুদা?

—সম্বলপুরে অনেকবারই গিয়েছি। কিন্তু বামরাতে গিয়েছি মাত্র দুবার। একবার ছেলেবেলাতে গিয়েছিলাম জেঠুমনির সঙ্গে। অন্যবার প্রথম যৌবনে, জেঠুমনিরই সঙ্গে। সেবারে এক আধিভৌতিক ঘটনা ঘটেছিল। বিভূতিভূষণের "আরণ্যক"-এ যেমন আছে না?

—বলোনা, সে ঘটনার কথা আমাদের প্লিজ, ঋজুকাকা।

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, কলকাতার এই ফ্ল্যাটে বসে আধিভৌতিক ঘটনা কি জমবে? বরং আমরা যখন 'অকুস্থলে' যাচ্ছিই, তখন না হয় শোনা যাবে ঋজুদার মুখ থেকে। একেবারে জমে যাবে ব্যাপারটা।

আমি বললাম, ভটকাই-এর এই সাজেসানটা মান্য। তিতির কি বলছো?

—ঠিক। তিতির বলল।

এবার ভটকাই বলল। বামরার কেসটা কি? 'ফাগুয়ারা ভিলা' বা 'সপ্তম রিপুর' মতো পারিবারিক মার্ডার? ওই রকম সব কেস-এ আমি ইন্টারেস্ট পাই না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, তবে তুই বড় গোয়েন্দা, তোর কথা আলাদা। আমার তো চয়েস নেই, সব কেসই হয় নিতে। বিশ্বল নিজেই শিওর নয়। যদি মার্ডার হয়েও থাকে তাহলেও আমাদের কারও আঙুলেই রক্ত লাগেনি। সপ্তম রিপুর মতো যশাকাঙ্ক্ষাও এই কেসে সম্ভবত নেই। তিন নম্বরের মতো শুধুই অর্থলোভও নেই। কিংবা জানা নেই, থাকতেও পারে। পরিবারের সমস্ত ক্ষমতা একজনের হাতে কুক্ষিগত করার চক্রান্ত হয়তো আছে। এই কেসটা ঠিক গোয়েন্দাগিরির কেস না। তাই মনে হয়, এতে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করাটাও আদৌ সহজ হবে না।

—তাহলে কি লাভ কি? আমি বললাম।

তিতির বলল, সব কেসেই, সব পরীক্ষাতেই যে 'উইথ ফ্লাইং কালারস' সাকসেসফুল হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। বরং মনে করা উচিত 'ফেলিওরস আর দ্য পিলারস অফ সাকসেস'। আমরা একজনকে ঘৃণা করতে পারি, তার অর্থ ও ক্ষমতার লোভের জন্য তাকে অনুকম্পা করতে পারি, তার মুখে থুথুও দিতে পারি ; কিন্তু, অত সহজে আইনের চোখে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি পাওয়াতে পারি না। আমাদের হৃদয়ের দরবারের অনুশাসন যে আদালতের অনুশাসনের সঙ্গে মেলে না। মেলে তো নাই-ই, অনেক ক্ষেত্রে এই দুই অনুশাসন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতেও অবস্থান করে। এক বিচিত্র অবস্থা। অসহায় অবস্থা।

—তাহলে গিয়ে কাজ নেই।

আমি আবারও বললাম।

—কার্যসিদ্ধিই যদি না হয়, না গেলেই হয়তো হত।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, কিন্তু ভাবছি, বহুদিন তো বাইরে যাওয়া হয় না। বেড়ানোকে বেড়ানোও হবে আর কাজটা যদি হয় তবে তো উপরি পাওনা হল।

তারপরই বলল, পুরুণাকোটের মানুষখেকো বাঘের কথা মনে আছে তোর রুদ্র? সেই যে আমি আহত হলাম তার আক্রমণে, আর তুই পুব আফ্রিকায় যেমন করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলি—গুণ্ডগেণ্ডস্বারের দেশে, তেমন করেই বাঘের আক্রমণে আহত আমাকে নিয়ে তেমনই নাস্তানাবুদ হয়েছিলি।

—মনে আছে। তবে তুমি ভারী বাড়িয়ে বলছ।

—সেই পুরুণাকোট থেকেও ঘুরে আসতে পারা যাবে।

—তিতির গেছে পুরুণাকোটে, ভটকাই তো যায়নি। কোন পথ দিয়ে যাবে?

—বাঃ! জুজুমোরার পথ দিয়েই।

তারপর বলল, সম্বলপুর থেকে রেঢ়াখোলের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জঙ্গলের পথ গেছে। জঙ্গলে গিয়ে বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তুলে নিয়ে পুরুণাকোট-বাঘামুণ্ডা, টল্বকা, লবঙ্গী এসব জায়গাতেও যাওয়া যেতে পারে। আসলে গত তিনবারই আমরা ঝাড়খণ্ড-এর হাজারিবাগ আর পালামৌ জেলাতে গেলাম। তোর 'ফাগুয়ারা ভিলা', 'তিন-নম্বর', আর 'সপ্ত রিপুর' পটভূমিতে। সপ্তম রিপু নামটা কিন্তু তুই জব্বর দিয়েছিস। শব্দটা দেখবি চালু হয়ে গেছে।

ঋজুদা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, কেসটা বিশ্বলের নয়। তার ছোট বোন অম্বাবতীর। যিনি গিরিধারী পারিজার বিধবা। পারিজা গ্রুপ একটি বড় বিজনেস হাউস। গিরিধারীবাবুই তার প্রতিষ্ঠাতা।

ভটকাই চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, তুমি লপচু চা-কে এত ভাল বললে

বটে ঋজুদা, কিন্তু ব্যানার্জিদের মকাইবাড়ি চায়ের স্বাদই বেশি ভাল লাগে।

তিতির বলল, মকাইবাড়ির চায়ের চেয়ে ব্যানার্জি সাহেবের শিকারের গল্পই আমার আরও বেশি ভাল লাগে। ওঃ! এখনও মনে পড়লে হাসিতে পেট ফেটে যায়।

ঋজুদা বলল, তা ঠিক। তাছাড়া ভদ্রলোকের গল্প বলার ধরনটাও ভারী মজার।

দুদিন পরে ঋজুদা সকালবেলা ফোন করে বলল, পরশু তাহলে রাত সোয়া ন'টাতে সাউথ ইস্টার্ণ রেলের নতুন প্ল্যাটফর্ম, ১৮ নং প্লাটফর্মে, সম্বলপুর এক্সপ্রেস-এ জমায়েত হচ্ছি আমরা। স্টেশনে যাবার পথে আমার একটু কাজ আছে। তোরা সোজা চলে যাস এক সঙ্গে। আমি পৌঁছে যাব। ফার্স্ট ক্লাস-এসি নেই ও গাড়িতে। টু-টায়ার এসি। রিজার্ভেশান চার্ট দেখে কম্পার্টমেন্টটা খুঁজে নিস। যে কম্পার্টমেন্টটাই দিক আমরা তো চারজন থাকব।

আমি বললাম ঠিক আছে।

ঋজুদার ফোন পেয়েই তিতিরকে ফোন করলাম।

তিতির বলল, পরশু বাবা দিল্লি যাবেন কাজে। গাড়িটা ম্যানেজ করে নিতে পারব আশা করি। আমি তোমাকে তুলবো। ভটকাই-এর বাড়ি তো উত্তর কলকাতাতে তাই আমাকে উল্টো দিকে যেতে হবে ওকে তুলতে। ও বরং রুদ্রর বাড়ি চলে আসুক ঠিক সময়ে। মেট্রো ধরে এলে তো সময়ও

লাগবে না বেশি।

—না, তা লাগবে না।

ভটকাই বলল।

তারপরই বলল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? যে ব্যাপারটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট।

আমি হেসে বললাম, ঋজুদা বলেছে বেঙ্গল ক্লাব থেকে তুলে নেবে। ভেটকি মেয়োনিজ, গার্লিক ব্রেড, আর লেমন-পাফ্।

—বাঃ! জমে যাবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে তোরা গোটা ছয়েক মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে নিস।

শেষ রাত থেকেই ট্রেনে ঠাণ্ডাটা বেশ বেশি বলেই মনে হচ্ছিল। কম্বল সরিয়ে উঠে পড়ে কোচ অ্যাটেনডেন্টকে গিয়ে বলে এলাম ঠাণ্ডা-টা একটু কমিয়ে দিতে। যখন বলতে গেলাম তখনই দেখলাম, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বুঝলাম যে সেই জন্যেই ঠাণ্ডাটা বেশি লাগছে। কোচ অ্যাটেনডেন্ট-এরও বোধ হয় ঠাণ্ডা বেশি লাগছিল। তিনি কম্বলে মাথা ঢেকে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। কম্বল সরিয়ে উঠে এসি কন্ট্রোল যেখান থেকে করতে হয় সেখানে গিয়ে ঠাণ্ডাটা কমালেন।

—ট্রেন কি লেট আছে?

—কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না বাইরে। তারপর নিজের হাতঘড়ি দেখে বললেন, আমার হিসেব মতো ঠিক টাইমেই যাচ্ছে।

ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমাদের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এলাম। নামেই কম্পার্টমেন্ট—পর্দা দিয়ে আব্রু করা। রাতে যাঁরা বাথরুমে যাবেন-আসবেন তাদের সঙ্গে শুয়ে থাকা অথবা ঘুমন্ত যাত্রীদের মাথায় বা পায়ে ধাক্কা লেগে

যায় প্রায়ই। তবে কেউই কিছু মনে করেন না, কারণ তাঁরা নিজেরা যখন যান তখনও অমনই ধাক্কা লেগে যায়।

ফিরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টাখানেক বাদেই কি একটা স্টেশনে 'গরম চায়ে', 'গরম কাফি' হাঁকতে হাঁকতে দু-তিনজন ফেরিওয়ালা উঠে পড়ল। ঋজুদা আর তিতির নিচের বার্থদুটোতে শুয়ে ছিল। ঋজুদা উঠে পড়ে বলল, কী রে, রুদ্র, চা খাওয়াবি না কি? এবারে উঠে পড়। অন্ধকার বলে বোঝা যাচ্ছে না, ছ'টা বেজে গেছে।

তিতিরও উঠে বসে বলল, এ চা মুখে দিতে পারবে না, বরং কফিই খাও।

—না রে। লাল্লুজীর দয়ায় আমাদের ছেলেবেলার ভাঁড়ের চা যখন এতদিন পরে পাওয়াই যাচ্ছে, তখন চা-ই খাব। চা-টা গৌণ, মাটির ভাঁড়ের গন্ধটাই আসল। ছেলেবেলার কত কথাই যে মনে পড়ে যায়। তবে তোদের ইচ্ছে হলে তোরা কফি খা।

ভটকাই ওপরের বার্থ থেকে বলল, না, না, এক যাত্রাতে পৃথক ফল কেন হবে? সকলেই চা খাব।

আমি বললাম, গন্তব্যে পৌঁছে তো রান্নাঘরের বেড়ালনির মতো সেখানে ছুক ছুক করবিই। তোর সব মতামতই আমাদের মানতে হবে। তা'বলে সাতসকালে ট্রেনের মধ্যে বসেও তোর গাজোয়ারি মানতে হবে? তুই ভেবেছিসটা কি?

ঋজুদা মধ্যস্থতা করে বলল, না, না, যার যা খুশি খা।

এদিকে আমাদের চা না কফি এই তর্কের মধ্যে চা-ওয়ালা এবং কফিওয়ালা দুজনেই কম্পার্টমেন্টের অন্য প্রান্তে চলে গেল।

আমি লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে তাদের মধ্যে যাকে হাতের কাছে পেলাম, তাকেই পাকড়াও করে নিয়ে এলাম।

তিতির বলল, কি আছে?

দুটো ঢাউস কেটলি দেখিয়ে সে বলল, দুই-ই আছে। কি খাবেন সেটা বলুন।

আমরা যার যা পছন্দ তা-ই খেলাম।

ঋজুদা বলল, তোমার ভাঁড়টা যে বড়ই ছোট বাবা। দু কাপ করে দাও। গলাই গরম হবে না যে।

চা-কফিওয়ালা চা-কফি দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

ভটকাই জিগ্যেস করল তিতিরকে—ঝাড়সুগুদা আসতে কত দেরি?

—আর আধ-ঘণ্টা। ট্রেন টাইমেই আছে।

তিতির বলল। ওই আমাদের টাইম কিপার।

ঋজুদা বলল, তবে আর কি। এবারে একে একে তৈরি হয়ে নাও সকলে।

ঋজুদা বলল, আগে যখন ভাল রাস্তা হয়নি তখন ঝাড়সুগুদাতে নেমে টিটলাগড় প্যাসেঞ্জার ধরে বামরাতে যেতে হত।

—কোথায় থাকব আমরা? বামরাতে?

ভটকাই জিগগেস করল।

ঋজুদা বলল, কিছুই জানি না। ট্রেন থেকে নেমেই জানা যাবে। বামরাতে না থেকে সম্বলপুরেও থাকতে পারি। বিশ্বল যা বন্দোবস্ত করবে তাই হবে। আমাদের ত অম্বাদেবীর সঙ্গেই কাজ। তিনি নাকি এখন সম্বলপুরে বিশ্বলের সঙ্গে আছেন। তবে তো সম্বলপুরে থাকাটাই ভাল হবে। দেখা যাক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

তারপর বলল, আর তোমাদের সকলকেই বলে দিচ্ছি এবং বিশেষ করে ভটকাইকে, তোমরা একটা কথাও কেউ বলবে না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দেবে। কেসটা অত্যন্ত সেনসিটিভ। বিশ্বলের সঙ্গে আর কে আসবে না আসবে তাও জানা নেই। তাই অপরিচিতর সামনে মুখ খোলা একেবারেই চলবে না। বুঝেছো।

ভটকাই সাত-সকালেই এমন ওয়ার্নিং-এর জন্যে তৈরি ছিল না। আমরা আশ্বস্ত হলাম, কিন্তু সে একটু দমে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন ঢুকল ঝাড়সুগুদা স্টেশনে। আমাদের কোচের সামনেই একজন লম্বা চওড়া সম্ভ্রান্ত মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। নমস্কার করে বললেন ঋজুদাকে, শেষ পর্যন্ত যে এলে বোস সে জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমরা বুঝলাম যে, ইনিই বিশ্বল সাহেব। বিশ্বল সাহেবের সঙ্গে একজন ফর্সা সুদর্শন ছিপছিপে ভদ্রলোক ছিলেন। বিশ্বল সাহেব আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনি ক্ষণজন্মা ঘোষ। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ইনিই আমার শালাবাবুদের পারিজা গ্রুপের সব ব্যবসাপত্রর অ্যাকাউন্টস ও ট্যাক্সেশন-এর ব্যাপার স্যাপার দেখেন। কোম্পানি আইনের ঝামেলাও সব সামলান। কটকের মহান্তি অ্যান্ড দাস নামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্ম থেকে সি. এ পাশ করেছিলেন।

আমরা সকলেই লক্ষ্য করলাম যে ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। বাঁ পাটা ডান পায়ের চেয়ে একটু ছোট। কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়তো হয়েছিল কখনও। ভদ্রলোক সুদর্শন বটে, কিন্তু চেহারাটা চোর চোর।

—তোমার ভগ্নীপতিদের কোম্পানির নাম কি বিশ্বল?

বহুবচনের প্রয়োজন নেই। আমার একমাত্র বোন অম্বাবতী। তাই একই ভগ্নীপতি ছিলেন। আমার বোন-ভগ্নীপতির তিন ছেলে। তাঁদের মধ্যে বড় জন আর সেজ জন একমাসের মধ্যেই গত হয়েছেন। এখন আছে শুধু আমার ভগিনীর মেজো পুত্র। সকলে তাকে 'মেজোকর্তা' বলেই ডাকে।

—অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন কি দুজনেই একসঙ্গে?

ইনকরিজিবল ভটকাই প্রশ্ন করল বিশ্বল সাহেবকে।

ঋজুদা চাবুকের মতো রোষ-কষায়িত দৃষ্টি হানল একটা ভটকাই-এর দিকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ফিউজ হয়ে গেল।

বিশ্বল সাহেব, যেহেতু ভটকাইই প্রশ্নটা করেছিল, তাই তাকেই বললেন, না, বড় ভাগ্নেকে বামরার কাছেই জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট নদীর ধারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার বন্দুকটিও তার

পাশে পড়ে ছিল। সেই ডাবল-ব্যারেল বন্দুকের একটি ব্যারেলের গুলি ফোটা ছিল।

ক্ষণজন্মা ঘোষ বললেন, ফোটা গুলিটিও বন্দুকের কাছেই পড়েছিল।

—বন্দুকে ইজেক্টর ছিল কি?

ঋজুদা প্রশ্ন করল।

—আজ্ঞে? ইজেক্টর মানে?

ক্ষণজন্মা ঘোষ অ্যাকাউন্টেন্সির বাইরের এই প্রশ্নে আউট-অফ-সিলেবাস-এর প্রশ্নের মতো হতবাক হয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

—ইজেক্টর মানে জানেন না?

ক্ষণজন্মাবাবু বললেন, ন্-না। বন্দুক-টন্দুকের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি তো অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

ওই ক্ষণজন্মা ঘোষ ভদ্রলোক সবসময়েই দুটি হাত জড়ো করে কথা বলেন। শিক্ষিত, বড় চাকরি করা মানুষ অথচ এমন অতি বিনয়ী বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। উনি এতটাই বিনয়ী যে আমাদের নানা মালপত্র, তার মধ্যে ওয়েপন্সও ছিল, বইবার জন্যে দুটি কুলি নেওয়া সত্ত্বেও ভটকাই-এর যে ব্যাগটি বাড়তি ছিল, ভটকাই সেটি তুলতে যেতেই ঘোষসাহেব হাঁ হাঁ করে নিজেই সেই ব্যাগটি তুলে নিয়ে কাত হয়ে বেশ কষ্ট করেই বইতে লাগলেন।

ঋজুদা প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, এ কী করছেন আপনি? ছিঃ ছিঃ। কীরে ভটকাই, নিজের ব্যাগটাও নিজে নিতে পারিস না। নইলে আর একটি কুলি নিয়ে নে। তা বলে মিস্টার ঘোষকে দিয়ে বওয়াবি?

ভটকাই অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমাকে তো হাতই দিতে দিলেন না উনি। দিন স্যার ব্যাগটা আমাকে দিন।

ক্ষণজন্মা ঘোষ বললেন, না, না স্যার। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের দিয়ে মাল বওয়ালে আমার পাপ হবে। তা ছাড়া মেজোকর্তা, মানে ধন্যবাবু জানলে পরে আমার চাকরিটাই চলে যাবে।

একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভদ্রলোক, যিনি একটি বড় গ্রুপের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তাঁর এই অতি-বিনয় আমাদের সকলেরই দৃষ্টিকটু মনে হল। তবে হতে পারে যে, উনি অত্যন্ত বনেদী পরিবারের ছেলে—বিনয়টা বংশপরম্পরাতে পেয়েছেন। সংসারে কত কীই ঘটে, আমরা এ বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা জানি।

ভাবছিলাম আমি।

ভটকাই ফিস ফিস করে আমাকে বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস?

—কি?

—লোকটার শার্টটার উপরের দিকের দুটি বোতামই খোলা। বুকে একগাছিও চুল নেই।

—তাই?

আমি বললাম।

স্টেশনের বাইরে এসে ঋজুদা বলল, কোথায় উঠব আমরা? বিশ্বল?

—ঠিক করেছি, তোমাদের সম্বলপুরেই ওঠাবো। মহানদী কোল ফিল্ডস-এর গেস্ট হাউসে। খুব কমফর্টেবল। ডিরেক্টর্স বাংলোতেই বন্দোবস্ত করেছি। আমি একটি টাটা সুমো গাড়ি দেব আর আমার বড় ভাগ্নেও, মানে মিস্টার ঘোষের মেজোকর্তা একটি ইন্নোভা গাড়ি দিয়ে দেবে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবহারের জন্যে। আমার গাড়িও চব্বিশ ঘণ্টা তোমাদের ডিসপোসালেই থাকবে।

—তোমার নিজের গাড়ি?

—না, না ও ভাড়ার গাড়ি।

তারপর বললেন, সম্বলপুর থেকে বামরা কাছেই। অনেকখানি রাস্তাই চমৎকার। বাকি কিছুটা রাস্তা সরু এবং ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে। তবে পথ কোথাওই কাঁচা নেই তাই বর্ষা এসে গেলেও যাতায়াতের কোনওই অসুবিধে হবে না বলেই মনে হয়। তারপর বললেন, মিস্টার ঘোষ রোজ সকাল সাড়ে আটটার সময়ে ডিরেক্টর্স গেস্ট হাউসে পৌঁছে যাবেন এবং

তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বামরা, যদি বামরা তোমরা যেতে চাও। দুপুরের খাওয়া দাওয়া বামরাতেই ওদের গেস্ট হাউসেই করতে পারো, যদি ইচ্ছে কর। তারপর উনি আবার তোমাদের সম্বলপুরে পৌঁছে দিয়ে যাবেন সন্ধ্যার পরে।

ঋজুদা বলল, প্রথম দিন আমাদের পথ দেখিয়ে দিলেই হবে। আমরা কি খোকাখুকু না কি যে হারিয়ে যাব। আমার এই চেলা-চেলিরা ছেলেমানুষ বলে এদের সত্যিই ছেলেমানুষ ভেবো না। এরা সবাই সব বিশ্বভ্রমী। আফ্রিকা, স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এরা আমার সঙ্গে ঘুরেছে। আর শুধু ঘোরেইনি, নানা দুঃসাহসিক কাজ করেছে, ভয়াবহ মানুষখেকো বাঘ মারা থেকে ডাকাতের পিছু নেওয়া থেকে নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন। ওরা প্রত্যেকে আমার চেয়েও কমপিটেন্ট। আমি বাংলোতে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি দেখতে আর বই পড়তেও পারি—ওরাই তোমার দুই ভাগ্নের হঠাৎ মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে পারবে। গড উইলিং।

—ইনশাল্লা।

ঋজুদার লক্ষণরেখা পেরিয়ে বলল বেশরম ভটকাই।

—এসো, এবারে গাড়িতে ওঠো।

বিশ্বল সাহেব বললেন।

ঋজুদা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে ক্ষণজন্মা ঘোষ হাতজোড় করা অবস্থাতেই বললেন, সেজবাবুর মৃত্যুতে আর রহস্য কি ছিল? তিনি তো সিমলিপালে গিয়ে ফিরে আসার পরে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আবার রহস্য কি?

ভটকাই আবারও ফাউল করে বলল, হোয়াইট ইজ অ্যাপারেন্ট মে নট বি রিয়্যাল। বুঝলেন কি না স্যার।

ভটকাই এমন করে বাক্যটি বলল যে মনে হল কেউ যেন মিঃ ঘোষের গালে চটাস করে এক বিরাশী-সিক্কার চড় কষাল। ব্যাপারটা ইংরেজিতে যাকে বলে এমনই 'APT' হল যে ঋজুদাও ভটকাইকে ভর্ৎসনা করল না।

কিন্তু আমি বুঝলাম যে ভটকাই কাজটা ভাল করল না। যে কোনও গোয়েন্দাগিরিতে এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজটাই হচ্ছে আসল। বিশেষ করে, কে শত্রু আর কে মিত্র তাই যখন জানা নেই, তখন আমরা কী ভাবছি না ভাবছি তা আগ বাড়িয়ে কাউকেই জানানো উচিত নয়। আমিই ভটকাইকে আনলাম ঋজুদার হাতে পায়ে ধরে 'রুআহা'র অভিযানের পর। আর ওর এখন এমনই হাব ভাব হয়েছে যেন ঋজুদারই বস ও। ওর কারণে ভারী লজ্জা হয় আমার।

গাড়িতে ওঠার সময় ঋজুদা এমন একটা কাণ্ড ঘটালো যে আমার মনে হল ওই ক্ষণজন্মা ঘোষ মানুষটাকে ঋজুদার আদৌ পছন্দ হয়নি। অথবা বেশি পছন্দ হয়েছে। তবে মানুষটার অস্বাভাবিক বিনয় আমাদের সকলের কাছেই অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। অতি বিনয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "চোরের লক্ষণ" হয়ে থাকে।

ঋজুদা বিশ্বল সাহেবকে বলল, আমার তো ওসব অঞ্চল চেনা। বিশ্বল, তুমি আমার চেলাদের নিয়ে টাটা সুমোতে যাও পথের দুপাশের নানা গাছ, পাহাড় চেনাতে চেনাতে আর আমি মিঃ ঘোষের সঙ্গে যাই। আপনার ভাগ্নেদের ব্যবসা, এবং একই মাসের মধ্যে দুই ভাগ্নের মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু জানার তা জানতে জানতে। সব কি আর জানা যাবে।! তবে প্রাথমিক তথ্য তো জানা যাবে।

বিশ্বল সাহেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। মহানদী কোল ফিল্ডস কেন্দ্রীয় সরকারের। ওএনজিসি বা সিংগ্রাউলির নর্দার্ন কোল ফিল্ডস বা বিলাসপুরের সাউথ-ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস-এর মতো অত লাভজনক কোম্পানি না হলেও বেশ লাভজনক কোম্পানি। ঋজুদার কাছেই শুনেছি ট্রেনে যে উনি এখন এখানকার দু'নম্বর সাহেব। তবে মাস ছয়েকের মধ্যেই ওঁর এম. ডি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মানুষটির সততার সুনাম আছে নাকি। ওএনজিসির সুবীর রাহারই মতো। তবে সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থাতে সততা অনেক সময়ে গুণ না হয়ে দোষ বলেই বিবেচিত হয়। দেখা যাক কী হয়।

মস্ত লাল-রঙা ইন্নোভা গাড়ি আগে বেরিয়ে গেল ক্ষণজন্মা ঘোষ আর ঋজুদাকে নিয়ে। বিশ্বল সাহেব, ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করতেই বললেন, বাবুলি, বেশি জোরে চালাবে না, বৃষ্টি পড়ছে, চাকা স্কিড করতে পারে।

বাবুলি বলল, এইরকম বৃষ্টিতে চাকা স্কিড করে না স্যার, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে করে।

—তাই? তা হবে।

তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন, বললেন, ওর নাম বাবুলি বেহারা। এই এ সি গাড়ি বাবুলি আপনাদের জন্যে নিয়ে এসেছে ভুবনেশ্বর থেকে। যে ক'টি এ সি গাড়ি আছে এখানে সবই অ্যালট করা আছে। তাই ভুবনেশ্বর থেকেই আনাতে হল। আপনাদের ডিউটি শেষ হলে ভুবনেশ্বরেই ফিরে যাবে।

তিতির বলল, আপনি ঋজুকাকার বন্ধু। তাঁকে তুমি বলছেন আর আমাদের আপনি, এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি আমাদের তুমিই বলুন।

উনি বললেন, বেশ। তাই হবে।

তারপর বললেন, সাইড লাইটটা জ্বালিয়ে দাও বাবুলি।

ড্রাইভার সাইড লাইট জ্বালিয়ে দিল। বৃষ্টিতে পথ ভাল দেখা যাচ্ছে না।

ড্রাইভার যেহেতু স্থানীয় মানুষ নয়, এবং বিশ্বল সাহেবের ভগ্নীপতির কোম্পানি অথবা তাঁর ভাগ্নে বা ক্ষণজন্মাবাবুরও পরিচিত নয়, তার সামনে কেসটার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে বলে মনে করে আমি বললাম, কেসটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি একটু জানিয়ে দেন আমাদের। ঋজুদাকে সব বলেছেন নিশ্চয়ই।

—না। বলিনি। সময় পেলাম কোথায়। তবে একেবারেই যে বলিনি তাও নয়। বলেছিও অনেক কিছু। সেদিন কলকাতাতে পরপর এতগুলো মিটিং ছিল তাজ-এ এবং কোল ইন্ডিয়ার অফিসে। কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এসেছিলেন তো—তাই ঋজুকে আসার জন্য রাজিই করিয়েছিলাম। তবে আমি এখানে ফিরে একটা ফাইল বানিয়েছি। যতখানি

ইনফরমেশন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব তার সবই তাতে আছে। আরও যা জানতে চাও তোমরা তাও জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই বলব। সেই ফাইলটি সম্বলপুরে পৌঁছে ঋজুকে দিয়ে দেবো আমি। তবে তোমাদের শর্ট-এ যতটুকু বলা যায়, বলছি।

—আমার বোন অম্বাবতীরই অনুরোধে ঋজুকে এখানে এনেছি আমি। কারণ, তার সন্দেহ যে তার ছেলেদের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, তার অন্য অভিযোগও আছে। গিরিধারী পারিজার সঙ্গে বিয়ে হয় আমার একমাত্র বোন অম্বাবতীর। আমার বাবার অবস্থাও অত্যন্ত ভাল ছিল। বাবা অঙ্গুলের সিভিল সার্জন ছিলেন। পরে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সম্বলপুরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন। অম্বাবতী আমার একমাত্র বোন। সম্বলপুরে বিরাট বাড়ি আছে। চারমল-এ খামার বাড়িও। দেখাশোনার লোক আছে। আমি তো মরারও সময় পাই না।

—গিরিধারীবাবু শুধু আমার ভগ্নিপতিই ছিলেন না। আমার দাদার মতোই ছিলেন। অনেক গুণের মানুষ ছিলেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই প্রচণ্ড অ্যামবিশাস। আমার বড় দাদা তাঁরই সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন। মেটালার্জিকাল এঞ্জিনিয়ার। তবে উনি চাকরিতে না এসে প্রথমে সুন্দরগড়ে একটি ম্যাঙ্গানিজ মাইনের ব্যবসা শুরু করেন। আমিও একটা সময়ে ওড়িশা রাজ্যের ম্যাঙ্গানিজ করপোরেশনে চাকরিতে ঢুকেছিলাম। চার বছর চাকরি করার পর কোল ইন্ডিয়াতে জয়েন করি। গিরিধারীদা সুন্দরগড়ের কাজ গুটিয়ে নিয়ে বামরা আর নরসিংপুরে তাঁর ব্যবসার সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর সততা, ব্যবহার এবং বিজনেস অ্যাকুমেনের দ্বারা তিনি দেখতে দেখতে মস্ত বড় করেন তাঁর ব্যবসা। সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গেই তাঁর মেশার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এমন মানুষ তো ব্যবসাতে সফল হবেনই। পারিজা গ্রুপের নানা কোম্পানি আছে। নানারকমের ব্যবসা তাঁদের। মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, নানা বড় কোম্পানির ডিলারশিপ। গিরিধারীদা বছর দশ আগে নভেম্বর মাসে হঠাৎ অফিসে কাজ করতে

করতেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মারা যান। ওঁর নিজেরই মস্ত বড় এবং নামী নার্সিংহোম ছিল সম্বলপুরে। কিন্তু ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস। সেখানে তাঁকে নিয়ে যাবার সময়ই তো পাওয়া গেল না। মরার বয়স তো তাঁর হয়নি। তবে খুবই অল্পবয়সে বিয়ে করাতে তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই-ই বড় তো হয়েই ছিল, সেটলও করে গিয়েছিল।

—কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন উনি?

—মাত্র আটষট্টি।

—তখন ওঁর বড় সন্তানের বয়স কত ছিল?

—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—ছত্রিশ।

—ও।

—মারা গেলেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে। কিন্তু তার বছর দুই আগে থেকে অ্যালঝাইমার রোগে ভুগছিলেন গিরিধারীদা। চলে যে গিয়েছেন একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। সে বড় বাজে অসুখ।

—তারপর।

—গিরিধারীদার মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন পর থেকেই আমার বোন অম্বার সঙ্গে আমার মেজো ভাগ্নের স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছিল না একেবারেই। মেজোবৌমা ছিল পুরীর রাজাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সেই জন্যেই সম্ভবত সে খুবই দেমাকী। তাছাড়া, স্বামীর মৃত্যুর দশ বছর পরে মাত্র এক মাসের মধ্যেই পরপর বড় ছেলে এবং ছোট ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে অম্বার মনও খুব খারাপ হয়েই গিয়েছিল। তার আগেই গিরিধারীদার উইলের কথাটা প্রকাশ হয়েছিল। বড় অশান্তির মধ্যেই দিন কাটছিল তাঁর। তাই আমি যখন এখানেই আছি, ওকে আমি আমার কাছেই নিয়ে আসি। আমার বাংলো খুবই বড়। দাসদাসীরও অভাব নেই। দুটি গাড়িও আছে। তাছাড়া, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার একমাত্র ননদিনীর খুবই ভাব। সত্যি কথা বলতে কি, আমার স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেই আমি অম্বাকে আমার কাছে এনে

রাখি। আমার কাছে এবং আমার স্ত্রীর কাছে অম্বা সবসময়েই বিলাপ করত, ঘুমের মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠত। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে ওই দুই মৃত্যুই স্বাভাবিক নয়। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

তারপর বললেন, এখানে আছে, ভালই আছে। মাঝে মাঝে ননদ-ভাজে আমাদের চারমল-এর খামারে গিয়ে থাকে।

—ঋজুদাকে আপনি চিনলেন কি করে।

—ঋজুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলই। তার জেঠুমণিকেও চিনতাম। গিরিধারীদার খুব শিকারের সখ ছিল। সেই সুবাদে ঋজু আর তার জেঠুমণি এদিকে প্রায়ই শিকারেও আসতেন। এ অঞ্চল ছাড়াও ওড়িশার এমন জনপদ ছিল না, মানে করদ রাজ্য, যেখানে ওঁরা এবং গিরিধারীদা শিকারে যেতেন না। তখন তো শিকারও ছিল প্রচুর এবং সমস্ত ভাল জঙ্গলেই শিকারের পারমিট দিত। রাজত্ব চলে গেলেও রাজাদের নিজেদেরও নিজস্ব কিছু জঙ্গল ছিল। অবশ্য ১৯৭২-এর পর সারা দেশেই শিকার বেআইনি হয়ে যাবার পরে শিকার আর একেবারেই করতেন না, কী গিরিধারীদা, কী ঋজুবাবুর জেঠুমণি। কিন্তু জঙ্গলে যাওয়া ছাড়েননি ওঁরা কেউই। আমার বড় ভাগ্নেরও শিকারের সখ ছিল। সে একটু চোরা শিকারও করত।

—মানে, যাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে?

ভটকাই বলল।

—হ্যাঁ। বিশ্বল সাহেব বললেন। শিকার বড় নেশা, একবার সে নেশাতে ধরলে চট করে ছাড়া মুশকিল। আমার বড় ভাগ্নে সপ্তাহান্তে বামরাতে অথবা তার ধারে কাছে শিকারে যেত লুকিয়ে-চুরিয়ে। তার এক সঙ্গী ছিল শিকারের। তাঁর নাম ছিল গাদু দাস। তবে সে বিশেষ কিছু করত না বলে গিরিধারীদা তার নাম দিয়েছিলেন বারুঙ্গা।

—বারুঙ্গা শব্দের কি কোনও মানে আছে? ওড়িয়াতে?

তিতির শুধোল।

—আছে বৈকি। ওড়িয়াতে বারুঙ্গা মানে হল, ভ্যাগাবন্ড। গাদু তাতে

কিছুই মনে করত না। বড় ভাগ্নের মোসাহেবী করেই তার দিন কাটত। তবে মানুষটার কোনও লোভ ছিল না। অতি সাদামাঠা জীবন যাপন করত। সে বিয়েও করেনি। সে একটু পাগলাটে ছিল। তবে পুরো পাগল নয়। পুরো সময়ের বা সেয়ানা পাগলও নয়। তার পাগলামির লক্ষণও সবসময়ে প্রকট হত না। অমরকণ্টকের নর্মদা বা গয়ার ফল্গু নদী যেমন অন্তঃসলিলা, তেমন গাদুর পাগলামিও তলে তলে বইতো, বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল ছিল। উন্মাদ তো আর ছিল না। বছরের মধ্যে বার কয়েক দিন পনেরোর জন্যে তাকে পাগলামিতে পেত, নইলে আইনের ভাষায় যাকে বলে Lucid Interval—ও সেই সময়ে স্বাভাবিক-ই থাকত।

তারপরে একটু থেমে বিশ্বল সাহেব বললেন, গাদু বিয়ে করেনি বটে কিন্তু তার এক বাইয়ানির সঙ্গে প্রেম ছিল।

—বাইয়ানি মানে?

—বাইয়ানি মানে, পাগলি। সে পুরোপুরিই পাগলি, তবে শিশুকালে সে পাগলি ছিল না। যৌবনে পাগলি হয়। সে বামরাতেই থাকে তার বাবার সঙ্গে। বাবাও পারিজা কোম্পানিতেই কাজ করেন। তবে রিটায়ার করবেন শিগগির। তার সঙ্গে বারুঙ্গার বিয়ের কথাও হয়েছিল। কিন্তু আমার মেজো শালা, যে গিরিধারীদা মারা যাবার পরে এই পুরো ব্যবসার সাম্রাজ্যের Kingpin—তার প্রবল আপত্তি থাকাতে বিয়েটা হয়নি। বিয়ে না হওয়ার দুঃখেই বোধহয় একজন পুরো পাগল হয়ে যায়, আর অন্যজন আধ-পাগল।

তারপর বললেন, গাদু দাস কিন্তু খুবই ভাল শিকারী ছিল। তার অদম্য সাহসও ছিল। পায়ে হেঁটে সে গুণ্ডা হাতিও মেরেছিল একটা। আর বাঘ-ভাল্লুক তো অনেকই মেরেছিল। তাকে যখন পাগলামিতে পায় তখনও তাকে পাগল বলে বোঝা যায় না। শুধু একটু উল্টো-পাল্টা কথা বলে হেঁয়ালি-হেঁয়ালি। বড় ভাগ্নের বন্ধু বলে এবং পারিজা কোম্পানির পুরোনো কর্মচারীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম থাকাতে সে এই ব্যবসার এবং হয়ত পরিবারের অনেক কিছু গোপন কথা জানে। সে জন্যেই তাকে মেজো ভাগ্নে

সবসময় চোখে চোখে রাখে। বাইরের লোককে কখন কি বে-ফাঁস কথা বলে দেয়, সেই ভয়েই। গাদু দাস, ওরফে বারুঙ্গাই হচ্ছে মেজো কর্তার Pain in the Neck। আমার ভগিনী অম্বা কিন্তু গাদুকে খুবই ভালবাসে। গাদুও বৌদি বলতে একেবারে অজ্ঞান। গিরিধারীদাও তাকে খুব ভালবাসতেন এবং আর্থিক সাহায্যও করতেন। গাদুর বাড়িটাও উনিই বানিয়ে দেন। সে বাড়ির একটি অংশ ভাড়া দিয়েই তার এখন চলে। কারণ মেজোকর্তা তাকে ভি আর এস দিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে টাকা বামরা পোস্টঅফিসে জমা রেখে দিয়েছে ও। মাসে মাসে যা সুদ পায় এবং অম্বা যা দেয় তাতেই চলে এখন। সে আমার বাংলোতে আসেও মাঝে মাঝে অম্বার সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে মাঝে কেন প্রতি সপ্তাহে। এ জন্যেও মেজো ওকে আরও অপছন্দ করে। ও আমার কাছে এলে ওর সঙ্গে তোমাদের সকলের এবং ঋজুরও আলাপ করিয়ে দেব। আজই আসার কথা আছে তার। আজ তো শনিবার, তাই না?

—হ্যাঁ। ভটকাই বলল।

—পথের দু'পাশটা এখনও ফাঁকা ফাঁকাই। চমৎকার পথ বানিয়েছেন ওড়িশা সরকার। স্টেট হাইওয়ে নম্বর ৪৯। পথে নানা জায়গাতে টোল ট্যাক্স নেয় সরকার। গাড়ি, বাস ও অন্যান্য দু-চাকার মোপেডের কাছ থেকেও। তাতে সরকারের খরচ অল্পদিনের মধ্যেই উঠে আসবে। বললেন বিশ্বল সাহেব।

ভটকাই বলল, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তো এমন অনেক পথ তৈরি করতে পারে নিজেদের খরচে এবং পরে জনগণের কাছ থেকে টোল নিয়ে সে খরচ তুলে নিতে পারে, এমনকি লাভও করতে পারে।

—তা তো পারেই। উত্তর প্রদেশে দেখেছি এমন বহু পথ আছে। শুনেছি, পঞ্চাশের দশক থেকেই ওঁরা এরকম রাস্তা বানাচ্ছে। অন্য অনেক রাজ্যও নিশ্চয়ই বানিয়েছে।

বাঁদিকে একটি মোড় দেখা গেল। বিশ্বল সাহেব বললেন, ওড়িয়াতে

মোড়-কে বলে ছক। আর যেখানে চার রাস্তা এসে মিলেছে তাকে বলে চারিছক। এই জায়গাটার নাম কিরেই। এখান থেকে বাঁয়ে গেলেই বামরা।

—খুব গভীর জঙ্গল নেই তো।

আমি বললাম।

—আছে। এই ছক-এ নেই তবে কিছুটা এগিয়ে গেলেই দু'পাশে গভীর জঙ্গল পড়বে। বাবুলি পথ চেনে, যদিও সে ভুবনেশ্বরে থাকে। বহুবার যেতে হত তাকে টুরিস্ট নিয়ে। পথের দু'পাশে অনেক আকাসিয়া ও শিরিষ গাছ আছে। বছরের এই সময়ে দেখবে পাতা শুকিয়ে খয়েরি-রঙা হয়ে গেছে। পথে পাবে ছোট্ট নদী 'সফৈ' এর ওপরে লোহার পুরোনো সরু ব্রিজ। এত সরু যে একটা গাড়ি পার হতে পারে। এখন চওড়া ব্রিজ হচ্ছে। বামরার পথে মসনিকালি এবং উত্তাবাহাল নামের দুটি গ্রাম পড়বে। পথটা খুবই নির্জন এবং দু'পাশেই মুখ্যতঃ শালজঙ্গল। তবে জংলি নিম, খয়ের, তেঁতুল, অর্জুন, মহুয়া ইত্যাদি গাছও আছে। আরও কি গাছ আছে জানো?

—কি?

—কুরুবক।

তিতির বলল, মিস্টার কালিদাস এখানে কখনও ক্যাম্প করেছিলেন কিনা জানি না। চারদিকে কুরুবকের মালা। তবে বৃষ্টি আর মেঘের বহর দেখে আমারও মেঘকে দূতী করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু দূতী করে চিঠিটা পাঠাব কার কাছে?

তারপর বললেন, বিশ্বল সাহেব, কিরেই থেকে বামরা যাবার পথে বাঁদিকে মেধেশ্বরের মন্দিরে যাবার সরু জঙ্গলাকীর্ণ পথ আছে।

—মেধেশ্বর কোন দেবতা?

ভটকাই প্রশ্ন করল।

বিশ্বল সাহেব আমাদের সঙ্গে এমন সহজ হয়ে উঠেছেন বলেই বোধহয় ভটকাই ঋজুদার লক্ষ্মণ-গণ্ডী পুরোপুরি পেরোতে সাহস পেল।

—মেধেশ্বর মহাদেবের আরেক নাম। তোমরা তো কম্যুনিস্ট রাজ্যের

মানুষ। ভগবানে বিশ্বাস করো না। ওড়িয়ারা কিন্তু অধিকাংশই খুব ধর্মভীরু।

ভটকাই বলল, সব বাঙালিই ঈশ্বর অবিশ্বাসী এমন নয়। বামফ্রন্ট তো পঞ্চাশ শতাংশ ভোটই পেয়েছে। যাঁদের ভোট পায়নি তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী।

আমি বললাম, ঈশ্বরে বিশ্বাস তো করেনই, ভূতেও করেন।

—ঋজুর কাছে জিজ্ঞেস কোরো। একবার ওর জেঠুমণির সঙ্গে শিকারে এসে এই বামরাতেই ওর এক আশ্চর্য আধিভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। উনি বললেন।

—ঋজুকাকা সে কথা বলেছিলেন আমাদের। সেই গল্পটাও শুনতে হবে। তিতির বলল।

পথে আমরা দুটি জনপদ পেরিয়ে এলাম। একটির নাম রেঙ্গালি, অন্যটির নাম সাসন। পথের দু'পাশেই ঝাঁটি-জঙ্গল, বিক্ষিপ্ত মহুয়া, শাল এবং তেঁতুল। ক্বচিৎ সেগুন। বোঝাই যাচ্ছিল যে আগে এখানে ভাল জঙ্গল ছিল। সাসনের কাছে পথের ডানদিকের পাহাড়শ্রেণির নাম মাওলাভঞ্জা অর্থাৎ মামা-ভাগ্নে। আর বাঁদিকের পাহাড়শ্রেণির নাম গড়পাটিয়ে। পথের দু'পাশে যে সাদা সাদা যুঁইয়ের মতো ফুল ফুটেছে তার নামই কুরুবাকি। গাছগুলি নাকি অনেকই বড় হয়।

আমরা সম্বলপুরের কাছাকাছি এসে গেছি মনে হল। ঋজুদা আর ক্ষণজন্মা ঘোষের ইন্নোভা গাড়ি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও গাড়ির ড্রাইভারটা রেকলেস। সম্বলপুরে ঢোকার আগে ডানদিকে ছোট ছোট ন্যাড়া পাহাড়ের শ্রেণি। তার নাম, বিশ্বল সাহেব বললেন, লক্ষ্মী-ডুঙ্গী আর বাঁদিকে, বেশ দূরে, বারা পাহাড় শ্রেণি। মানে, বারোটি পাহাড়ের সমষ্টি। তারই পেছনে নাকি মহানদী এবং তার ওপারে হীরাকুঁদ বাঁধ। নদী পেরিয়ে ডানদিকে গেলে সম্বলপুরের শহর, মা সমলেশ্বরীর মন্দির আর বাঁদিকে বুড়লা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ।

বিশ্বল সাহেব পথে একটি ছোট নদী পেরুবার সময়ে ভটকাই-এর প্রশ্নর

উত্তরে বললেন, এই নদীর নাম 'ইভ'।

ভটকাই বলল, মিস্টার অ্যাডাম কোথায় গেলেন?

নানা গাছ-গাছালি ঘেরা প্রকাণ্ড হাতা পেরিয়ে আমরা মহানদী কোল ফিল্ডস-এর ডিরেক্টরস বাংলোতে এসে পৌঁছলাম অবশেষে। ঋজুদা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ড্রইংরুমে বসে ক্ষণজন্মা ঘোষ-এর সঙ্গে গল্প করছিল। ক্ষণজন্মা ঘোষের মতো ইন্টারেস্টিং মানুষ আগে দেখিনি। বিনয়ের প্রতিমূর্তি যেন। হাত দু'খানি সব সময়েই জোড়া করে রাখা, মুখে স্মিত হাসি আর একটি বাক্যর মধ্যে, সে বাক্য যেমনই হোক না কেন, দুটি থেকে তিনটি 'স্যর' বলছেন। ওড়িয়ারা 'স্যার'কে 'স্যর' উচ্চারণ করে। পদবীতে ঘোষ হলেও বহুপুরুষ ওড়িশাতে থাকাতে মনে হয় ওরা কথাবার্তাতে, সংস্কৃতিতে, ওড়িয়াই হয়ে গিয়েছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই দু'হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন, পথে কোনো কষ্ট হল কি স্যরদের আর মাদামের?

ভটকাই বলল, নট অ্যাট অল। তবে আপনার সঙ্গ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম, এইটুকুই কষ্ট। এই আর কি।

—আমি তো স্যর আছিই আপনাদের সেবাতে।

বিশ্বল সাহেব কথা কেটে বললেন, ঘোষ এবারে এদের রেস্ট করতে দাও। ট্রেন-জার্নি করে এসেছেন—তাও তো এ ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস এসি নেই। আজকে আর তোমাকে দরকার নেই। আমিই এদের বিকেলবেলা মা সমলেশ্বরীর মন্দির এবং বুড়লা দেখিয়ে দেব।

তারপর তিতিরকে বললেন, যদি সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি কিনতে চাও তাহলে সেসব দোকানেও পাঠিয়ে দেব একদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আজ দুপুরে এখানেই লাঞ্চ। এখন তো চান-টান করে ব্রেকফাস্ট খাও। লাঞ্চ-এ কি খাবে বলে দেবে। বাবুর্চি জগবন্ধু চমৎকার বাংলা বলে। চাইনিজ, মোগলাই, কন্টিনেন্টাল যা বলবে বানিয়ে দেবে। অত্যন্তই ভাল বাবুর্চি সে। দাঁড়াও আলাপ করিয়ে দি। ঐ যে চা নিয়ে আসছে এদিকেই জগবন্ধু।

দেখলাম, একটি ছোটখাট, ফর্সা, সাদা উর্দিপরা মানুষ মস্ত ট্রের ওপরে

বোন-চায়নার টি-পট, কাপ-ডিস, দুধ ও চিনির পট সাজিয়ে এনে ডাইনিং টেবল এর ওপরে রাখল। একতলাতে কোনও বেডরুম নেই। একপাশে ড্রয়িং রুম, অন্যপাশে ডাইনিং।

ক্ষণজন্মা ঘোষ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বিশ্বল সাহেব বললেন, ঘোষ, তুমি তাহলে তোমার গাড়ি নিয়ে চলে যাও বামরা। মেজোকর্তাকে সব রিপোর্ট দিও। কালকে তুমি সকালে এসে এখানেই ব্রেকফাস্ট সেরে ওঁদের নিয়ে বামরা যেও। তোমার গাড়ি নিয়ে এসো, এ গাড়িও থাকবে ওঁদের ডিসপোজালে চব্বিশ ঘণ্টা। ওঁরা তো বামরাতে থাকতে আসেননি—একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন আর কি। আমার ভগ্নীপতি গিরিধারীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন ঋজুর জেঠুমণি। আমার শালাদের সাম্রাজ্য একটু দেখে যাবে। ওঁরা এখানেই থাকবেন। ওঁদের নিয়ে পরে রেঢ়াখোলে যাব—অঙ্গুলেও যেতে পারি—আমি শনি-রবির সঙ্গে দু'দিন ছুটি নেব ভাবছি। আজ রাতে ডিনার আমার বাড়িতেই। তবে তোমাকে রাতের বেলা কষ্ট করে বর্ষা-বাদলের মধ্যে আসতে হবে না।

ক্ষণজন্মা ঘোষ হাত জোড় করে তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন।

—নাও। চাটা খেয়ে তুমি তাহলে এগোও ঘোষ। প্রায় তাড়িয়েই দিলেন ক্ষণজন্মা ঘোষকে বিশ্বল সাহেব।

—স্যর।

আবার বললেন, ঘোষ সাহেব।

ক্ষণজন্মা ঘোষ চলে যেতেই বিশ্বল সাহেব বললেন, ক্যারেক্টার একটি। কি বলো ঋজু? এটুলির মতো সেঁটে থাকে।

ঋজুদা, পাইপটা ভরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, সে আর বলতে! 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।' এ একটি রত্ন। খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে।

বিশ্বল সাহেব তো বটেই আমরা সকলেই ঋজুদার কথাতে হেসে উঠলাম।

চা খেয়ে বিশ্বল সাহেব বললেন, আমি তাহলে এগোই। আমি সাড়ে চারটে নাগাদ আসব। বলো তো আরও আগে আসতে পারি। মন্দির এবং অন্যান্য জায়গা ঘুরে টুরে আমার বাংলোতে সাতটার মধ্যেই পৌঁছে যাব। ততক্ষণে বারুঙ্গা মানে গাদুও এসে যাবে নিশ্চয়ই বামরা থেকে। হয়ত এতক্ষণে এসেই গেছে। অম্বা এখানে আমার কাছে আসার পর থেকে ও এলে রাতটা এখানেই থেকে যায়। প্রতি শনিবারেই আসে। তারপর রবিবারে দুপুরে খেয়েদেয়ে তারপর ফিরে যায় বামরা।

—ফেরে কিসে? তুমি গাড়ি দাও?

—গাড়ি দিতে অসুবিধে কি? তবে বারুঙ্গা কখনওই গাড়িতে যায় না। ওর আত্মসম্মানজ্ঞান খুবই টনটনে। মেইন রোড অবধি হেঁটে গিয়ে বাস ধরে বামরা পৌঁছায়। বাস তো নানা জায়গাতে থামতে থামতে যায় তাই সময় লাগে বেশি। ও বলে, জুঁইবাবু, দুপুরে যা খাওয়া হয় রাতে প্যাংলাকে বলি যে খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা না করতে। খিদে যদি পায়। তবে দু'মুঠো মুড়ি চিবিয়ে শুয়ে পড়ি।

—জুঁইবাবু মানে কি?

ঋজুদা বলল, তোরা সবই ভুলে যাস। ওড়িয়াতে জামাইবাবুকে জুঁইবাবু বলে তা তোরা জানিস না?

—প্যাংলাটা কে?

তিতির শুধোলো।

—ও। প্যাংলা হল গাদুর খিদমতগার। প্যাংলাই বারুঙ্গার দেখাশোনা সব করে। ম্যান-ফ্রাইডে। বৌ কে বৌ, লোকাল গার্জেন কে লোকাল গার্জেন।

তার পর বিশ্বল সাহেব উঠে পড়ে বললেন, সী উ্য।

তার পরই বললেন, ওঃ ভুলেই গেছিলাম, ওই যে ফাইলটা।

ব্রিফকেস খুলে একটা চটি ফাইল দিলেন উনি ঋজুদাকে।

—যা যা চেয়েছিলাম সব দিয়েছ তো?

—সব।

—ও কে।

—আমি বাংলোতে পৌঁছে এই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবুলিকে লাঞ্চ খাওয়ার ছুটি দিয়ে দাও। বাজার থেকে খেয়ে আসবে। টাকা দেওয়া আছে ওকে।

ঋজুদা বলল, এখন তো আমাদের গাড়ির দরকার নেই। ও যেন চারটে নাগাদ চলে আসে। তোমার গাড়িতে তো সকলের জায়গা হবে না।

—না, তা হবে না। তবে গাড়িটা এখানেই ফিরে আসুক। কখন কি দরকার হয়। গাড়িটা সবসময়েই সঙ্গে থাকা ভাল।

—যা ভাল মনে করো।

ঋজুদা বলল।

বিশ্বল সাহেব চলে গেলে ঋজুদা বলল, সবাই চান করে নাও। ব্রেকফাস্টে কে কী খাবে জগবন্ধুদাদাকে বলে দাও। ব্রেকফাস্ট করে তোরা সবাই এগারোটা নাগাদ আমার ঘরে আয়। তোদের ব্রিফিং করতে হবে।

তার পরই ভটকাই ওর দিকে ফিরে বলল কি রে! দেখেছিস।

—কি?

অবাক হয়ে বলল, ভটকাই।

—আধ-পাগল বারুঙ্গার যে বুদ্ধিটুকু আছে তাও তোর নেই।

—কি? কি বলছ?

—দু'মুঠো মুড়ি খেয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। মুড়ির মতো জিনিস আছে! খাওয়ার ব্যাপারে যে তোর মতো এত Fussy সে বনে-জঙ্গলে ঘুরবে কি করে?

ভটকাই উত্তর না দিয়ে কিলটা হজম করে নিল।

এই বাংলোর পুরোটাই কার্পেটে মোড়া। প্রতিটা ঘরই এয়ার কন্ডিশনড। নিচের ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমেও স্প্লিট-এয়ার কন্ডিশনার লাগানো।

বহুদিন পরে এমন ব্রেকফাস্ট খেয়ে ভটকাই সত্যিই খুশি হয়েছিল। ঢেকুর তুলে বলেছিল, ফাস ক্লাস। দুধ কর্নফ্লেক্স-সঙ্গে ইয়া ইয়া মোটা বর্তমান কলা।

তিতির বলল, বর্তমান নয়, মর্তমান।

—ঐ হল। যা বর্তমান তাই মর্তমান। তার পর সসেজ, হ্যাম, সালামি-মাস্টার্ড দিয়ে, বেকড-বিনস, পোচড-এগস, কড়কড়ে করা ব্রাউন বেড-এর টোস্ট। সঙ্গে মার্মলেড, মাখনের স্ল্যাব। আহা! মনটা ভরে গেল র‍্যা।

তিতির বলল, এক নম্বরি পেটুক এবং ফাজিল।

ঋজুদা ফ্যামিলি ট্রি-টা আমাদের দেখতে দিল।

ব্রেকফাস্টের পরে ঋজুদার দোতলার ঘরে আমরা সকলে জমায়েত হতেই ঋজুদাই প্রথমে একটা কাগজ নিয়ে বলল, দ্যাখ ফ্যামিলি-ট্রি।

গিরিধারী পরিজা + অম্বাবতী পারিজা (NEE সিং দেও)।

—Neeটা কি ব্যাপার?

ভটকাই বলল।

—Nee মানে হচ্ছে Maiden Surname মানে কুমারী পদবী।

১। (বড়ছেলে) সরিৎশেখর (সনাবাবু)। প্রয়াত। পুলিশ বলেছে আত্মহত্যা।

মেজো ছেলে সূর্যশেখর (ধনাবাবু)।

ছোট ছেলে স্বর্ণশেখর (ফুচকুবাবু) সদ্য প্রয়াত। অসুখে।

২। পরিবারে মেজোকর্তাই সব। গিরধারীবাবু অ্যালঝাইমার রোগে আক্রান্ত হবার পর থেকে মেজো ছেলেই সর্বেসর্বা।

৩। পারিজা গ্রুপে সব সুদ্ধু দশটি কোম্পানি আছে। সবই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। গ্রুপের নাম পি সি এল। বাইরের শেয়ারহোল্ডার কেউ-ই নেই।

গিরিধারীবাবু প্রবল পরাক্রান্ত প্যাট্রিয়ার্ক ছিলেন। অম্বাবতীকেও কোনও শেয়ার দেননি। একমাত্র মেয়ে সৌদামিনীকেও নয়। এবং উইল করে গিয়েছিলেন যে তার পরিবারের কোনও মেয়েরাই, মানে নাতনিরাও পাবে না। পরিবারে একমাত্র মেজোবাবুরই তিন ছেলে। সৌদামিনী দিল্লির মিরান্ডা হাউসে পড়তে যায়। একটি পাঞ্জাবি এমবিএ ছেলের সঙ্গে লিভটুগেদার করে। এখন বস্টনে থাকে। মেজোকর্তা তাকে ডিস ওন করে। সম্পর্ক আছে একমাত্র তার মা, মানে অম্বাবতীর সঙ্গে। মামা বিশ্বলের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। ফোন করে, ই-মেইল এ যোগাযোগ রাখে। নিঃসন্তান।

ধনাবাবুরই তিনটি ছেলে। সনাবাবু আর ফুচকুবাবুর কোনও পুত্রসন্তান ছিল না এবং হবারও সম্ভাবনা ছিল না, তাঁদের মৃত্যুর পরে গিরিধারীবাবুর উইলের নির্দেশানুযায়ী সব শেয়ার বড়কর্তা এবং ছোটকর্তার মৃত্যুর পর মেজোকর্তার হাতেই vest করে যায়। ইতিমধ্যেই না কি দু'দুবার দুই ভায়ের শেয়ার কিনে নিতে চেয়েছিলেন মেজোকর্তা তাদের জীবদ্দশাতেই, Net Asset Value বা N. A. V.-র বিনিময়ে। কিন্তু N. A. V. তো সব কথা বলে না। প্রত্যেকটি কোম্পানিরই অনেক সিক্রেট রিজার্ভ আছে যার পরিমাণ

দিনকে দিন বাড়ছে। এদিকে মেজোকর্তার বড় দুই ছেলেই সেয়ানা হয়ে গিয়েছে। তারা বিদেশে লেখাপড়া করেছে। তারা বলেছে এই ধ্যাধ্বেড়ে গোবিন্দপুরে ব্যবসা করার একটুও ইচ্ছে নেই। তাদের অংশের টাকা তারা দাবি করেছে। দুজনেই আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। তবে যেহেতু তারা দেশে ফেরেনি এবং ব্যবসাতে যোগ দেয়নি, মেজোকর্তাও তাদের কোনও টাকাপয়সা দিতে রাজি হননি। তিনি নাকি উইল করেছেন ইতিমধ্যেই, যদিও তাঁর বয়স এখনও কিছুই হয়নি, যে তাঁর এবং পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তি সবই তাঁর স্কুল পড়ুয়া ছোট ছেলেকেই দিয়ে যাবেন। তবে দুটি শর্তে। শর্ত দুটি হল—যে সে বামরা এবং বড়জোর সম্বলপুরে থেকেই ব্যবসা করবে এবং তাদের মাকে ভালভাবে রাখবে, মায়ের দেখাশোনা করবে। অথচ বাবার মৃত্যুর পরে নিজের মা, অর্থাৎ বিশ্বল সাহেবের অনুজা, সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত অম্বাবতী দেবীর সঙ্গেও মেজোকর্তা খারাপ ব্যবহার করতেন এবং করেন। করতেন বলেই উনি এসে এখন তাই বিশ্বল সাহেবের সঙ্গে রয়েছেন। তার পর ব্যালান্স শিটের ফাইলগুলো আমাদের দিকে এগিয়ে দিল ঋজুদা।

আমি বললাম, আমরা কি বুঝবো এর?

—বুঝতে হবে বৈকি। গোয়েন্দাগিরি করবি আর সামান্য ব্যালান্সশিট বুঝবি না, ফিনান্সিয়াল ব্যাপার বুঝবি না, তা তো হয় না। সারা বিশ্বে এখন যত খুন খারাপি হয় তার অধিকাংশই তো হয় অর্থের কারণেই। অর্থেরই লোভে। এইসব ব্যালান্স শিট-এ যেসব ফিগার আছে তাই শেষ কথা নয়। এতে তো সিক্রেট রিজার্ভ নেই।

--সিক্রেট রিজার্ভ কাকে বলে।

ভটকাই বলল।

—সিক্রেট রিজার্ভ মানে, যে রিজার্ভ ব্যালান্স শিট-এর ফিগারে প্রতিফলিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ একটির কথা বলতে পারি। ইংল্যান্ড এর ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের...

—ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড মানে, ইংল্যান্ডের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তাই তো?

তিতির বলল।

—আমার বড়মামা বলেছিলেন।

—তোর বড়মামা কি ব্যাঙ্কে কাজ করতেন?

—আগে উনি একটি ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে উনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর ওম্বুর্ডসম্যান ছিলেন।

—তাই?

—হ্যাঁ।

—যা বলছিলাম, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের ব্যালান্স শিটে ব্যাঙ্কের বাড়ির ভ্যালু দেখানো আছে এক পাউন্ড। আসলে, সেই বাড়ির ভ্যালু হবে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড। এত বছর ধরে বাড়িটি ডিপ্রিসিয়েটেড হতে হতে তার ভ্যালু এক পাউন্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে মানে, পাছে অ্যাসেটটির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাই ওই এক পাউন্ড মূল্যেই দেখানো আছে। তাই ব্যালান্স শিট-এর ভ্যালুই শেষ কথা নয়।

তারপর বলল, যাই হোক, আমাদের এই কেস-এ ব্যালান্স শিট নিয়ে মাথা না ঘামালেও হয়তো চলবে। আমি চেয়েছিলাম, তাই দিয়েছে বিশ্বল। আমাদের কাজ হচ্ছে পারিজাদের বড় ভাই এবং ছোট ভাই-এর মৃত্যুর পিছনে কোনও রহস্য আছে কি নেই এবং রহস্য থাকলে তার পেছনে মেজোকর্তার বা অন্য কারও হাত আছে কি নেই, তা খুঁজে বের করা। কিন্তু খুঁজে বের করলেই হবে না। তা প্রমাণও করতে হবে। প্রমাণ করা না গেলে তো দোষীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

—বিশ্বলও নাকি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করবে?

—চাকরি? সে কি? যিনি নাম্বার ওয়ান হবেন ক'দিন পরেই, এখন তো তিনি ডিরেক্টর টেকনিক্যাল তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন?

তিতির আশ্চর্য হয়ে বলল।

—হ্যাঁ দেবেন। ঘুষ না খেলে সরকারি চাকরি করে বড়লোক তো হওয়া

যায় না। অথচ ছাত্রাবস্থা থেকেই বিশ্বলের খুব বড়লোক হবার ইচ্ছা। ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও সবাই-ই বড়লোক ছিল। গাড়ি-বাড়িওয়ালা। আমিই সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম। তবে বন-জঙ্গলের প্রতি ভালবাসাটা ওর সত্যিই ছিল। তাতে কোনও মেকি ছিল না। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের যোগসূত্রটাও সেটাই। তবে শিকার ও কোনওদিনও করত না। শিকার করা পছন্দও করত না। কিন্তু আমি সেই সময় শিকার করলেও ও আমাকে পছন্দ করত। তবে শিকার ছাড়াও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বর অন্য উপাদান ছিল, যা ছিল খুবই গভীর।

তিতির বলল, যেমন?

—যেমন সাহিত্য, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত।

আমি বললাম, চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি করবেন উনি?

—ও একটি কোল-ওয়াশারী প্ল্যান্ট খুলবে। তার জমি-টমিও ঠিক করে ফেলেছে। ওর সঙ্গে নাগপুরের নায়াররা আর একটা গ্রুপও নাকি জয়েন করবে। এই দুই গ্রুপই শুধু খুব পয়সাওয়ালাই নয়, খুবই করিৎকর্মা কোম্পানি। যাকে বলে 'DOERS'। যেন-তেন-প্রকারেণ কাজ হাসিল করাতে এই দুই গোষ্ঠী ভারত-বিখ্যাত বলে শুনেছি। তাছাড়া এই দুই গ্রুপেরই পলিটিক্যাল কানেকশানসও প্রচুর—যা ছাড়া আজকাল কোনও ব্যবসাতেই বড় হওয়া মুশকিল, বিশেষ করে এ দেশে।

—বিশ্বল সাহেবের এই বদলে যাওয়া ব্যাপারটা তুমি লক্ষ্য করনি?

—না। সত্যি বলছি, ওর এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমি কিছু জানতামও না। ওর সঙ্গে দু-তিন বছর অন্তর দেখা হত। হয় কলকাতাতে, নয় দিল্লিতে অথবা কোনও ফ্লাইটে। তবে দেখা কম হলেও উষ্ণতাটা মরেনি। দেখা হলেই সেটা দীপিত হত—ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে যেটা হয় আর কি! তবে ওর কর্মজীবন যে এমন পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে তার কোনো আভাসও আমি পাইনি। আর পাবোইবা কি করে! কোনও 'কমন ফ্রেন্ডস' তো ছিলই না বলতে গেলে। জঙ্গলের বন্ধুরা 'রক' এর বা ক্লাব এর বন্ধুদের মতো

সংখ্যাতে বেশি হয় না কোনওদিনও। সেই বন্ধুত্বের রকমটা চিরদিনই অন্যরকম—এবং অনেকেই গভীর। হয়তো ঠিক বোঝতে পারলাম না।

—কেন? না বোঝার কি আছে? তোমার সঙ্গে আমাদের এই অসমবয়সী বন্ধুতার রকম উপলব্ধি করেই তো আমরা তা বলতে পারি।

ঋজুদা হেসে বলল, কা-র-রে-ক্ট। এই তো ভটকাই কী সুন্দর অ্যানালিসিস করল বলতো আমাদের সম্পর্কে! গ্রে-ট।

তার পর বলল, অনেক কৃতী মানুষই পাবলিক সেক্টর ছেড়ে শেষ জীবনে প্রাইভেট সেক্টরে জয়েন করেন। তাঁদের যথার্থ মূল্য তো প্রাইভেট সেক্টরই দিতে পারে। এই যে ও. এন. জি. সির চেয়ারম্যান সুবীর রাহাকে ওরা রিটায়ারমেন্টের বয়সে পৌঁছনোর আগেই ওরকম ট্র্যাক রেকর্ডস থাকা সত্ত্বেও রিটায়ার করিয়ে দিল, তাতে রাহা সাহেবের কী এল গেল? ওঁকে প্রাইভেট সেক্টরের অনেকেই লুফে নেবে হয়তো। পাবলিক সেক্টরে অনেক কৃতী মানুষকেই নোংরা রাজনীতির শিকার হতে হয়।

আমি ঋজুদাকে বললাম, তোমার কি মনে হয়, বড়কর্তা আর ছোটকর্তার মৃত্যুর পিছনে মেজোকর্তার কোনও হাত থাকতে পারে?

—হয়তো পারে। আবার হয়তো পারেও না। সব পারিবারিক ব্যবসাতেই এক ভাই সবচেয়ে করিৎকর্মা হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই তার হাতেই পারিবারিক ব্যবসার ভার থাকে। আর স্বাভাবিক কারণেই তার উপরে পরিবারের সকলের ঈর্ষা ও রাগ থাকেই। বাবা যদি তাঁর উইলে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং সেই সিদ্ধান্তের ফলে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে জন্যে তো মেজোকর্তা দায়ী নন। এই দেশে কেন, সব দেশেই ক্ষমতাবানকেই সব সমালোচনা সহ্য করতে হয়, সে যতই ফেয়ার হোক না কেন।

তিতির বলল, তবে এটাও তো ঠিক যে "পাওয়ার করাপ্টস এবং অ্যাবসল্যুট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসল্যুটলি"—সে রাজনীতিতেই হোক বা পারিবারিক ব্যাপারেও।

—সেটা ঠিকই বলেছিস। তবে যে-কোনও গোয়েন্দাগিরিতেই আগ বাড়িয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে নেই। মানে, বায়াসড হতে নেই। খোলা মনে এগোতে হয় এবং কেউই "ধোওয়া-তুলসীপাতা" নয় এই মনোভাব নিয়ে এগোতে হয়। ফোরগন কনক্লুসান তো বটেই, সাসপিশান নিয়ে এগোলেও নিজেদেরই ভুল পথে যেতে হতে পারে। প্রত্যেককেই এই সন্দেহ যেমন করতে হয় তেমন কারওকেই দোষী ভেবে এগনোটা উচিত নয় আদৌ।

—বাঃ। অম্বাবতী ওর একমাত্র বোন। এবং মেজোকর্তা যেমন বিশ্বলের ভাগ্নে তেমন অন্যরাও তো তার ভাগ্নেই। তাদের কারো প্রতিই অন্যায় যাতে না হয় তা দেখা তো তার কর্তব্যর মধ্যেই পড়ে। তুই বা আমি হলে কি করতিস বা করতাম? তাই এ ব্যাপারে বিশ্বলের ইন্টারেস্ট থাকাটা স্বাভাবিক। আইনি ব্যাপারগুলো ওর কোম্পানির লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট এবং কোম্পানির সলিসিটরকে দিয়ে ও খোঁজখবর করেই এতদূর এগিয়েছে।

—তা হলে আমাদের এখন কী কর্তব্য?

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, প্রথম কর্তব্য হল বড়কর্তা বা সনাবাবুর মৃত্যু কি সত্যি সত্যি আত্মহত্যার কারণে হয়েছিল, না তাঁকে জঙ্গলে খুন করা হয়েছিল, তা জানা।

দ্বিতীয় কর্তব্য হল ছোটকর্তা বা ফুচকাবাবুর মৃত্যু কি সত্যিই রোগে হয়েছিল, না তাঁর মৃত্যুর পেছনেও কোনও রহস্য ছিল?

তৃতীয় কর্তব্য হল এই ক্ষণজন্মা ঘোষ মানুষটির এই অতি-বিনয়ের কারণটা কি? মেজোকর্তার হয়ে সে কি কোনও অপকর্ম করেছিল? যদি করে থাকে, তবে তার পেছনে উদ্দেশ্য কি? তার পরিবারে কে কে আছে? তাদের পারিবারিক অবস্থা কেমন? 'ইজ হি লিভিং বিয়ন্ড হিজ মিনস?' যদি অসদুপায়ে বা মেজোকর্তার দয়াতে তার অনেক টাকা বা সম্পত্তি হয়ে থাকে তবে তার উৎস কি?

ভটকাই বলল, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। এইরকম ঝামেলার কেস-এ নিজেই বা ফাঁসো কেন? আমাদেরই বা ফাঁসাও কেন? এই কেস এর সমাধান আমাদের দ্বারা হবে না। পরশু দিন টিকিট কাটতে বলে দাও। এখানে থেকে রহস্য উদঘাটন না করতে পারলে আমাদের বদনাম হয়ে যাবে। বলেই আমার দিকে ফিরে বলল, কি রে রুদ্র? ঠিক বলেছি কি না? চল, মানে মানে কেটে পড়ি এ জায়গা থেকে।

আমরা সকলেই চুপ করে থাকলাম।

ঋজুদা বলল, আপাতত এই। এবারে তোরা একেক করে চান করে একটু গড়িয়ে নে। রাতে তো কারোরই ঘুম হয়নি ভাল। লাঞ্চ খাব দেড়টায়, তার পরে আবার সেকেন্ড সেশান।

বিশ্বল সাহেব ঠিক সাড়ে-চারটের সময় এসে পড়লেন। আমরা চা-টা খেয়ে তৈরি হয়েই ছিলাম। দুপুরের খাওয়াটা শুধু গুরুই হয়নি, ভটকাই-এর মতো খাই-খাই মানুষও বলছে শুধু গুরু নয়, রীতিমতো গুরুতর হয়েছিল। রাতে নাকি পেটে কিল দিয়ে উপোস দেবে। জানি, এখন বলছে, কিন্তু খাওয়ার সময়ে গুরুতর তো বটেই গুরুতমও খেতে পারে।

ছেলেবেলাতে দেখেছি রোগা-প্যাংলা পুরুত মশাইরা অম্লান-বদনে পরিমাণে হাতির খাদ্য খেতেন এবং তার পরও ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতেন। কিন্তু ভটকাই-এর মতো কোনও পৈতেহীন অব্রাহ্মণকে এই পরিমাণ খেতে দেখিনি।

বাংলোর কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়েই বিশ্বল সাহেব বললেন, আগে কি দেখবে বলো?

আমরা ওঁর হুন্ডাই সোনাটা গাড়িতেই চাপাচাপি করে উঠেছি। উনি নিজেই চালাচ্ছেন।

বললেন, আমাদের প্রাইভেসির বিঘ্ন হতে পারে বলে টাটা-সুমো নিলাম না। ড্রাইভার থাকলে অনেক সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়।

ঋজুদা পাশে বসেছে। সামনে আর পেছনে আমরা তিনজন। বাবুলি বেহারা তার টাটা সুমো নিয়ে বাংলোর হাতার গাছতলাতে গাড়ি লাগিয়ে তার বনেটের ওপরে বসে বটুয়া থেকে পান চুন খয়ের ও গুণ্ডি সব বের করে পান খেতে বসল।

আজকাল এমন ওড়িশাদেশীয় কমই দেখা যায়। আমরা ছেলেবেলায় অনেক দেখেছি। পুরীর কাছের পিপলি থেকে কেনা লাল বা হলুদ রঙা কাপড়ের বটুয়াতে—তাতে আবার রুপোলি চুমকি বসানো—পান খাবার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ভরে পেতলের ছোট সুপুরি-কাটা কাঁচি, পেতলের চুন-দানি ইত্যাদি সব ভরে রাখত তারা। গুন্ডির গোল কৌটো, তাও পেতলের। সে একটা রিচুয়াল ছিল। আজকাল ভারতের সব প্রদেশীয়রাই নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে সাহেব হয়ে গেছে। সাহেবরা আমাদের ঠেঙিয়েও যা করতে পারেনি বা আমাদের দিয়ে করাতে পারেনি, আমরা নিজেদের তাগিদেই এখন তা হয়ে গিয়েছি এবং সোৎসাহে করছি। পোশাকে-আশাকে ভাষায় রুচিতে মানসিকতায় এক নব্য দু-পেয়ে জানোয়ারের প্রজন্ম হয়ে গিয়েছি। নেহাত চিড়িয়াখানাতে জায়গার অকুলান তাই পথেঘাটে অফিসে কাছারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এতসব কথা মনে মনেই ভাবলাম—বলব কাকে? বলে কি মার খাব? শাড়ি পরে নাকি কাজ করা যায় না। ইন্দিরা গান্ধী তো জিনস পরেই প্রধানমন্ত্রিত্ব করে গেলেন এতকাল! যার যা খুশি করতে পারে এবং করছেও, কিন্তু অত ফালতু বাহানা কিসের তা বুঝি না।

মহানদীর উপরের ব্রিজ পেরোলাম। জুনের প্রথম। সবে বৃষ্টি নেমেছে। নদী-বাঁধের অন্য পাশের জলাধারের জলসীমা এখনও নিচেই—তাই জল ছাড়তে দেরি আছে। শুকনো নদীর চেহারা ভারী বীভৎস। জল-ভরা, নদী দেখে এই নগ্নিকা রূপের ধারণাই করা যায় না। কত যে ছোট-বড় নানা

আকৃতির পাথরে এখন নদীর বুক ভরা তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না। কেন মহানদী নাব্য নয়, তা নদীর এই নগ্নিকা রূপ না দেখলে জানতাম না।

সমলেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে ঢুকলাম। সত্যি! চমৎকার মন্দির। মন্দিরের গা, বাইরের সীমানার দেওয়াল সবই সাদা রঙ করা। নদীপারের ফাঁকা জায়গাতে গড়ে উঠেছে বলেই এখানে জায়গার কোনও অকুলান হয়নি শহরের জনপদের। ভিতরে কটক শহরের কটকচণ্ডীর মন্দিরের মতো। তবে এক সময়ে কটকচণ্ডীর মন্দিরও বোধহয় নির্জনেই ছিল—মন্দির হয়েছিল বলেই হয়তো তার চারপাশে জনপদ গড়ে উঠেছে।

মন্দির দর্শনের পরে নদীর অন্যদিকে বুড়লাতে গেলাম। বুড়লা পড়াশুনোর জন্য বিখ্যাত। ঋজুদার বন্ধু কটকের বামরাবাদ-এর চাঁদুদার ছোট ভাই এখানের মেডিক্যাল কলেজের নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। অনেক বিদেশি ডিগ্রিও ছিল তাঁর। এই বামরারই রাজার দেওয়ান ছিলেন চাঁদুবাবুর বাবা শ্রী অমরল্লভ দে।

বুড়লা ঘুরিয়ে বিশ্বল সাহেব বললেন, ঐদিকে দারুণ জঙ্গল আছে। তোমরা সময় পেলে যেও।

ঋজুদা বলল, আমারও খুব প্রিয় বনভূমি এ। কি গভীর জঙ্গল যে দু'পাশে তোদের কি বলব। আর কি সুন্দর নাম সব জায়গার আর পাহাড়ের। চারমল, রেঙ্গানি-কানি, যাদুলুসিন, রেঢ়াখোল।

তিতির বলল, এই অঞ্চলের পটভূমিতে একটি একেবারে অন্যরকম উপন্যাস পড়েছিলাম, নাম 'দেওয়ালগিরি'। আনন্দ পাবলিশার্স এর বই। সেই বইয়ে তিনটি উপন্যাস একসঙ্গে আছে—বইটির নাম 'ত্রয়ী'।

—লেখা কার?

ভটকাই বলল।

—সম্ভবত জংলি বুদ্ধদেব গুহ'র।

—'যাদুলুসিন' নামটাতে কেমন লোশান লোশান গন্ধ আছে? না?

—সাব্বাস ভটকাই।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই এর নাকই আলাদা।

তিতির বলল, এক্কেবারে ল্যাব্রাডর গান ডগ-এর মতো।

ঋজুদা বলল, ঠিকই ধরেছিস ভটকাই। ওড়িয়াতে দাদকে বলে যাদু। যে পাহাড়ে দাদের ওষধির গাছ পাওয়া যায় তারই নাম যাদুলুসিন। যাওয়া যাবে একদিন। তবে গেলে রেঢাখোলও ছুঁয়ে একেবারে অঙ্গুল অবধিই যেতে হবে। নইলে, বিমলবাবু রাগ করবেন। বড় চমৎকার জঙ্গল, অথচ খুব কম ভ্রমণার্থীই এই জঙ্গলের খোঁজ রাখেন।

—বিমলবাবু?

বিশ্বল সাহেব শুধোলেন।

—বিমল ঘোষ। কটকের নরেন সুরদের ম্যানেজার ছিলেন। পূর্ণিয়ার খেলাৎচন্দ্র ঘোষের জঙ্গলের জমিদারির ম্যানেজারি করতে গিয়ে যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক' লিখেছিলেন, বিমলবাবু লিখতে পারলে তেমনই কোনও মহৎ উপন্যাস লিখতে পারতেন হয়তো। বন-জঙ্গল এবং বন ও বন্যপ্রাণী নিধন সম্বন্ধে ওঁর অভিজ্ঞতা বিপুল ও বিচিত্র। মানুষও অতি চমৎকার। আমাদের চেয়ে বয়সে বড় বিমলবাবু। এখন অঙ্গুলেরই সিমলিপদাতে থিতু হয়েছেন। ছেলে-বৌ, নাতিপুতি নিয়ে। ওঁর স্ত্রী চমৎকার মানুষ ছিলেন। গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল।

বিশ্বল সাহেব বললেন, আজ তা হলে সম্বলপুরী সিল্ক-এর দোকানটা বাকিই থাক, এবারে বাংলোতে ফেরা যাক। সেখানে অম্বা তো তোমাদের অপেক্ষাতে আছেই, বারুঙ্গাও এসে বসে আছে। তবে একটা গোলমাল, তার পাগলামিটা মনে হচ্ছে ফিরে এসেছে।

—কতদিন থাকবে পাগলামি?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক নেই। সাতদিনও থাকতে পারে আবার মাসখানেকও। তবে

বাইরে থেকে বোঝা বিশেষ যায় না। খুব লুজ-টক করে, উল্টো-পাল্টা কথা। এই সময়ে এবং সেইসব কথা অনেক সময়ই অন্যের পক্ষে খুবই এমবারাসিং হয়।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, তাই?

—হ্যাঁ। তাই ওর এই সময়কার কথাবার্তাকে সিরিয়াসলি না নেওয়াই ভাল।

ভটকাই বলল, সাধে কি আর কথা আছে "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।"

বিশ্বল সাহেবের বাংলো মস্ত বড় কম্পাউন্ডের মধ্যে।

অনেক গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে লম্বা ড্রাইভ। দেখে মনে হল তিন-চারজন মালি আছে, কম করে, ছোট-বড় সব গাছ তদারকির জন্যে। এই বাংলো ডিরেক্টরস গেস্ট হাউস এর চেয়েও ভাল। পর্চ-এ পৌঁছে গাড়ি থেকে নামলাম আমরা। বিশ্বল সাহেবের পার্সোনাল ড্রাইভার আমরা নেমে গেলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল গ্যারাজে। মস্ত গ্যারাজ। কম করে চারটি গাড়ি থাকতে পারে সেখানে।

বিরাট আলো-ঝলমল ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই বিশ্বল সাহেবের সুন্দরী, সুসজ্জিতা সফিস্টিকেটেড স্ত্রী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। ভিতর থেকে সাদা খোল আর কালো পাড়ের কটকি শাড়ি পরে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা এলেন। তাঁর কপালের দু'দিকের চুলে সোনালি আর সাদা রঙ লাগাতে তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও খুলেছে। বিশ্বল সাহেব বললেন, এই আমার বোন, অম্বাবতী। অম্বাবতীর পেছনে পেছনে ইস্ত্রিবিহীন ধুতি এবং ইস্ত্রিবিহীন নীল রঙের শার্ট পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক পান খেতে খেতে এলেন।

বিশ্বল সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন, এই যে গাদু দাস। গাদু দাস হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, প্রণাম আঁইজ্ঞা। আভ গুটে নাম আছি মোর, বারুঙ্গা।

আমরাও সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। আমাদের সহবতও উন্নত হয়ে উঠছে দেখছি সৎসঙ্গে। সকলে বসলে, বারুঙ্গাও বসলেন। তবে তিনি পায়ের চটিটি কার্পেটের উপর খুলে প্রথমে দুটি ধূলিধূসরিত পা তুলে বসলেন জোড়াসনে দামি সোফার উপরে, তারপর একটি পা নামিয়ে নাচাতে লাগলেন। বিরামহীন।

বিশ্বল সাহেব বললেন, ইনি ঋজু বোস, আমার বন্ধু, এবং এর জেঠুমণি গিরিধারীবাবুর বন্ধু ছিলেন, একসঙ্গে শিকার-টিকার করতেন।

—হঁঃ। মু জানিচি।

বারুঙ্গা বললেন।

—তুমি যদি বড় কর্তা আর ছোট কর্তার এই হঠাৎ মৃত্যুর সম্বন্ধে এঁকে কিছু বলতে চাও তো বলতে পারো।

বিরক্তির সঙ্গে বারুঙ্গা বললেন, মু কন কহিবি? মু কিচ্ছি জানিনান্তি। মু জানিবি কেমিতি? সব্বেমানে যা জানিচি মু তাইই জানিচি। আউ কন?

—বিশ্বল সাহেব বললেন, ঠিক অচ্ছি। তমুকু কিচ্ছি কহিবাকু হেবুনি।

—কহিবাকু কিচ্ছি নাই, মু কন কহিবি? তমমানে যাইকি সে ষড়া খোঁড়াক্ষণুকু পচারিছ নাই কাঁই? সে বেধুয়া সব্বে জানিচি।

ঋজুদা বলল, খোঁড়াক্ষণুটা কে?

বিশ্বল সাহেব বললেন, শুধু বারুঙ্গা একাই নয়, পারিজা পরিবারের সঙ্গে যারাই পরিচিত এবং জড়িত সকলেই ক্ষণজন্মা ঘোষকে খোঁড়াক্ষণু বলে ডাকে। ঐ লোকটাকে বড় ছোট শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউই দেখতে পারে না, সে যতই হাতজোড় করে অতি বিনয়ের সঙ্গে সকলের সঙ্গে কথা বলুক না কেন।

আমরা সকলেই অবাক হয়ে বললাম, তাই?

—তাই। অথচ ঔ খোঁড়াক্ষণুই মেজোকর্তার ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। তার গুপ্তচর। মেজোকর্তা তো রক্তকরবীর রাজা। তিনি তাঁর লাল বাতি জ্বালানো চেম্বার থেকে বেরোনই না। ঐ খোঁড়াক্ষণুই তাঁর চোখ, তাঁর

কান। সে তাঁর কানে যে মন্ত্র দেয় আমার মেজোশালা সেই বুদ্ধিতেই চলেন।

—এমন ক্ষমতার লোভ কেন মানুষটার? এদিকে তো তোমার কাছেই শুনেছিলাম যে সে অতি নির্লোভ, অতি সরল জীবনযাত্রা, নিরামিষাশি মানুষ তিনি। তাঁর যদি অর্থলোভই না থাকবে তবে এত ক্ষমতার লোভ কেন? অর্থলোভ আর ক্ষমতালোভ তো পরস্পর জড়িয়ে মড়িয়েই থাকে সচরাচর। অর্থলোভ নেই অথচ ক্ষমতালোভ আছে এমন মানুষ তো সচরাচর দেখা যায় না। ব্যাপারটা তো খুবই রহস্যময়।

আমি বললাম, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে নেই? স্ত্রী কোথাকার মেয়ে?

—সে তো ব্যাচেলর। বিয়েই করেনি। ছেলেমেয়ে আসবে কোত্থেকে?

—ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, বিয়ের বয়স তো এখনও যায়নি। কতই বা বয়স হবে ক্ষণজন্মাবাবুর, পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হবে ক্ষণজন্মার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম বারুঙ্গাকে, কত বয়স হবে ক্ষণজন্মার?

বারুঙ্গা বলল, সে হল বর্ণচোরা আম। চল্লিশও হতে পারে, ষাটও হতে পারে। ঐ ষড়াই তো মেজোকর্তাকে নষ্ট করল। কত ভাল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করাল। ও ব্যাটা না জানে ইনকাম ট্যাক্সো, না জানে অ্যাকাউন্টান্সি। এক প্যারাগ্রাফ ইংরেজি লিখতে পারে না। অন্য লোককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে মেজোকর্তাকে গিয়ে দেখায় নিজে লিখেছে বলে। ওর মতো একটা কুচক্রী বিষধর সাপ আমি কখনও দেখিনি। বড়কর্তা মানে আমার বন্ধু। সনার সঙ্গে তো আমি অনেক শিকারই করেছি ছোটবেলা থেকে, অনেক রকমের শিকার। কিন্তু আমার জীবনের শেষ শিকার করব আমি খোঁড়াক্ষণুকে। ওকে প্রাণে মারব না। ওর মেরুদণ্ড আর দুটো হাঁটুকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব অ্যালকাম্যাক্স এর লেথাল বল দিয়ে। ওর জন্যে কটকের এ টি দ্যঁ কোম্পানি থেকে চারটি গুলি তুলে রেখেছি আমি। ঐ নৈবেদ্য ওকে নিবেদন করার পরই আমার ছুটি। চতুর্থ বুলেটটি নিজের

থুঁতনির নিচে নল ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দেব।

বিশ্বল বলল, মুখে মাইক লাগিয়ে এ কথাটা সকলকে বলে বেড়াও, যাতে পুলিশ তোমাকে ধরে ফাটকে পুরে দেবে।

—পুলিশ আমার কি করবে। আমার বিচার হবে ওপরওয়ালার কোর্টে।

বিশ্বল সাহেব বললেন, তা ক্ষণু ঘোষকে মারাটা বিলম্বিত করছ কেন?

—করছি ক্ষণু ঘোষের এক পার্টনার আছে, তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। মানে যে দুজনে এই পরিবারের শনি, যারা দুজন মিলে ষড়যন্ত্র করে সনাকে আর ফুচকুকে মেরেছে তাদের জোড়ে মারব আমি। দুটোর মধ্যে একটাকে সাবাড় করলে তো চলবে না। অন্যটা যে ছোবল মারবে। তাই অপেক্ষা।

বিশ্বল সাহেব বললেন, আচ্ছা, এবারে তুমি একটু চুপ কর। অম্বাকে একটু বলতে দাও।

—ভাল কথা। মু আউ কিছি কহিবিনি। বলেই নিজের মনে বিড়বিড় করে কি যেন গেয়ে উঠল বারুঙ্গা।

—কন কহিলি তু?

বিশ্বল সাহেব বললেন।

—আউ কহিবি কন? আলো শুকিলা সাদু মন মরি গলা দ্বিপাহারু।

—হঃ। তু সে গানটা আউ কেত্বে গাহিবি?

বারুঙ্গা বলল, যেত্বে দিন দীনবন্ধু নৃসিংহ ন্যায় না করিচি তেত্বেদিন মু এ গান গাহিবি—বুলি বুলিকি সব্বস্থানে যাইকি গাহিবি।

তিতির বলল, ঐ গানের মানে কি ঋজুকাকা।

ঋজুদা হেসে বলল, এ আমার শোনা গান। ওড়িশার বড়ম্বার গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি দিশি মদের দোকানে এক পাগলকে দেখেছিলাম। বগলতলিতে এক বোতল পানমৌড়ি মদ নিয়ে একটি তেঁতুল তলায় বসে এ গানটি গাইছিল। এ তো গান নয়, এ এক দর্শন। দার্শনিকের গানও বলতে পারিস।

ভটকাই বলল, আগে মানেটা বলই না বাংলাতে।

—মানে হল, ওরে "শুকনো কচু, মন মরে গেল দ্বিপ্রহরে।"

—"আলো শুকিলা সাড়ু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু।" বুঝলি এবার মানে।

ঋজুদাকে তার গান বাংলাতে তর্জমা করতে দেখে খুশি হল গাদু দাস ওরফে বারুঙ্গা। তারপর হাসি হাসি মুখ করে বসে রইলো। হাতে ধরা বটুয়া থেকে একটা সাজা পান বের করে মুখে পুরে আক্ষরিকভাবে মুখ বন্ধ করে বসে রইলো। নিশ্চয়ই বেশি বেশি পরিমাণ গুণ্ডি ছিল পানে, মুখটা ফাঁক হলেই গন্ধে অত বড় ঘর ভরে যাচ্ছিল।

ভটকাই আমার কানে কানে বলল, অখয়েরি গুণ্ডিমোহিনী। আমি হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। অরবিন্দ জেঠু, মানে কবি অরবিন্দ গুহ (এবং গদ্যকার ইন্দ্র মিত্র) অখয়েরি গুণ্ডিমোহিনী পান খেতেন। ঋজুদার সঙ্গে তাঁর ভীষণ দোস্তি যেমন রমাপদ চৌধুরির সঙ্গেও, তিতিরের প্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহ যাঁর কাছ থেকে লেখা শিখেছেন।

ঋজুদা এবার বিশ্বল সাহেবের বোন অম্বাবতীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এবারে বলুন, আমরা আপনার জন্যে কি করতে পারি। আপনার মনে যা যা আছে সব আমাদের খুলে বলুন---আপনার অনুরোধেই আমাদের এখানে আসা—তারপর দেখি আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় কি না।

উনি গলাটা একটু খাঁকরে নিয়ে বললেন, সনা এবং ফুচকুর মৃত্যুটা আমি মেনে নিতে পারছি না। সনার মেয়েরা আমার সম্পত্তির কোনও ভাগ পাবে না একথা জানার পর থেকেই ওর মন অবশ্যই খারাপ ছিল। সে ভাগ থেকে উনি তো আমাকে আর ফুচকুকেও বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু তা বলে ও আত্মহত্যা করবে এমন বিশ্বাস আমার হয় না। সে আমার দাদারই মতো উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং সাহিত্যেরও খুবই অনুরাগী ছিল। চোরাশিকারও সে করত আমার সব মানা না শুনেই, কিন্তু জীবনকে সে খুবই ভালবাসতো। অনেক অভাবী মানুষ তার নিয়মিত দানেই বেঁচে ছিল। আত্মহত্যা করার মতো মানসিকতা তার একেবারেই ছিল না, তাই। সে যে আত্মহত্যা করবে এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

—যেদিন উনি মারা যান সেদিন শিকারে ওঁর সঙ্গে আর কে গিয়েছিল?

—বারুঙ্গাই তো যেত ওর সঙ্গে। সেদিনও বারুঙ্গাই গিয়েছিল। পুলিশ তো ওকেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। থানাতে নিয়ে গিয়ে খুব মারধোরও করেছিল। কেস দিয়ে ওঁকে ফাঁসিতে লটকাবার বন্দোবস্ত করেছিল। কিন্তু কোনও প্রমাণ ছাড়া সে কেস টিকবে না। তা আমার স্বামীর-র বিশেষ বন্ধু কৃপাসিন্ধু দাস—সম্বলপুরের খুব বড় ফৌজদারি উকিল—নিজে থানাতে গিয়েছিলেন এবং নিজে জামিন হয়ে ওকে এক লক্ষ টাকার জামিনে ছাড়িয়ে এনেছিলেন কোর্ট থেকে। সেই কেসের ফয়সালা এখনও হয়নি। তারিখ পড়ছে বারবার। তবে দাস সাহেব আমাকে কথা দিয়েছেন যে বারুঙ্গাকে উনি খালাস করে আনবেনই।

ঋজুদা, গাদু দাস ওরফে বারুঙ্গাকে জিজ্ঞেস করল, সেদিন কি হয়েছিল আমাদের খুলে বলুন। কোনও কিছুই গোপন করবেন না।

—গোপন করব কেন? গোপন করার কিছু থাকলে তো গোপন করব।

—বলুন।

—সনা শুয়োরের মাংস খেতে খুব ভালবাসতো। সবে গরম পড়েছে তখন, আমাদের শাগরেদ ফাটা রহমান এসে খবর দিল একটা প্রকাণ্ড দাঁতালো শুয়োরকে ও দূর থেকে দেখেছে এবং সফৈ নদীর বালিতে তার খুরের দাগও দেখেছে। দুটি বড় বড় বাঁকানো দাঁতও আছে। আমার বহুদিনের সখ ছিল শুয়োরের দাঁতের একটি চাবির রিং বানাবার আর সনার শখ ছিল শুয়োরের চামড়ার একটি ব্রিফকেস বানাবার। আর মাংস তো সকলেই খাব 'নলাপোড়া' করে।

—আগেকার দিন হলে তো হাঁকোয়া করেই শিকার করা যেত। কিন্তু হাঁকোয়া করতে কম করে জনা দশ-পনেরো লোক লাগে। শিকার তো এখন বেআইনি। অত লোককে কনফিডেন্স-এ নেওয়া যায় না। তাতে বেজায় বিপদ। কে গিয়ে বনবিভাগ বা পুলিশকে বলে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া। এখন তো আবার সেনাবাহিনীকেও বনরক্ষা-র কাজে ব্যবহার

করা হচ্ছে। তাছাড়া, ব্যাঙের ছাতার মতো এন জি ও গজিয়ে উঠেছে—'কে বা আগে প্রাণ করিবে দান' এ নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। হাঁকোয়া শিকারের ঝুঁকি আজকাল আর নেওয়া যায় না। টাটকা পায়ের খুরের দাগ ধরে একা একাই তা অনুসরণ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে তবে যদি শিকারকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনা যায়।

এই খবর সনাকে দেওয়ামাত্র সনা বলল, এ খবর কে এনেছে?

আমি বললাম, কে আবার? ফাটা রহমান। যে আমাদের এইসব জঙ্গলের সব জানোয়ারের ঠিকুজি কুষ্ঠির খবর দেয়, যে জঙ্গলের পোকা, যার জীবিকাই জংলি জানোয়ার মারা।

ভটকাই বিজ্ঞর মতো বলল, এইরকম বেআইনি পেশার মানুষের সঙ্গে আপনার আর সনাবাবুর মতো শিক্ষিত মানুষদের ওঠা-বসা কি ঠিক?

বারুঙ্গা বলল, এ দেশে যে টুকে টুকে বি এ, এম এ পাশ করা মানুষেরাই একমাত্র মানুষ বলে গণ্য। ফাটার মতো মানুষেরা কি না খেয়ে থাকবে? খেতে-পরতে তো হবে।

ঋজুদা ভটকাইকে ধমক দিয়ে বলল, ডোন্ট ইন্টারাপ্ট। তারপর?

ঠিক হল, তা হলে আগামীকালই ভোর ভোর বেরিয়ে পড়া যাক। ওর সান্ট্রো গাড়ি সফে নদীর পাশের জঙ্গলে এমনভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে রাস্তা থেকে কেউ দেখতে না পায়। সঙ্গে জলের বোতল, আর কিছু ফল একটি ঝোলাতে নিয়ে নেবে। সঙ্গে শুধু ফাটা রহমান থাকবে। জঙ্গলে পৌঁছে সনা আর ফাটা একসঙ্গে যাবে নদীর একদিকে—নদীর বালিতেই খুরের দাগ খোঁজা সহজ। ফাটারও একটি দোনলা বন্দুক আছে, বে-পালী বহু পুরনো ম্যান্টন কোম্পানির বন্দুক। তবে ফাটার হাত খুব ভালই। আর আমিও যাবো। চোট পকাইবা সঙ্গে সঙ্গে কে প্রাণ বাহিরিবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, সনার হাত তো খুব ভাল ছিল। দাঁতালো বড় শুয়োর বাঘের মতোই বিপজ্জনক। গুলি করে ধরাশায়ী না করতে পারলে উরু অবধি চিরে দেবে—পেট ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়িও বের

করে দিতে পারে। আমার উপরে সনার অগাধ বিশ্বাস ছিল। আমার বন্দুকটি ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির। ব্যালান্সও ভাল, মারও ভাল। এই বন্দুক দিয়ে মারিনি এমন জানোয়ার নেই।

আমি ভাবছিলাম, বারুঙ্গার বলা এইসব বন্দুক ও জংলি জানোয়ারের গল্প ঋজুদা তো অবশ্যই, আমরাও একটু আধটু জানি—তবে কিছু বলাটা হয়তো শোভন হবে না।

ঠিক সেই সময়ে বিশ্বল সাহেবই বললেন, মায়ের কাছে মাসির গল্প না করে এঁরা যা যা জানতে চান, তাই বল উত্তরে।

বারুঙ্গা লজ্জা পেয়ে থেমে গিয়ে বলল, হউ।

কটকের চাঁদুদাও ঠিক এমনি করে বলেন হউ। মনে পড়ল আমার।

ঋজুদা বলল, সনাবাবুর কি বন্দুক ছিল? মানে, বন্দুক এবং রাইফেল?

—ছিল তো অনেকই, তবে সেদিন সকালে জেমস পার্ডির একটি দোনলা বন্দুক নিয়েই গিয়েছিল।

—বন্দুকে ইজেক্টর ছিল?

—ছিল বইকি! ডাবল-চোক, ডাবল ইজেক্টর।

ডাবল-ইজেক্টর কথাটা শুনে অবাক লাগল আমার। আমি তো জানতাম ইজেক্টর থাকলে দু ব্যারেলেই থাকে। গুলি করার পরে বন্দুকের ব্রিচটা খুললেই গুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যারেল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। এতে ব্যারেল গুলি রি-লোড করতে অনেক কম সময় লাগে এবং বিপজ্জনক প্রাণী শিকারে এই ইজেক্টর লাগানো বন্দুক খুব কাজে আসে। হাত দিয়ে ফাঁকা কার্তুজ টেনে বের করে নতুন কার্তুজ ভরতে অনেকেই সময় লেগে যায়।

ঋজুদা বলল, তারপর?

—আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। তাতে আবহাওয়া যেমন ফাস-ক্লাস ছিল, নদীর ভেজা বালিতে শেষ রাতে এবং প্রথম সকালে চরা-বরা করা নানা জন্তু-জানোয়ার, পাখি ও সাপের খবর পেতেও আমাদের সুবিধে

হচ্ছিল। প্রথমে আমরা তিনজনেই একইসঙ্গে ছিলাম। নদীর ডান দিকে কিছুটা যেতেই বড্ডা দাঁতাল শুয়োরটার চিহ্ন পাওয়া গেল নদীর বালিতে। শেষ রাতে বৃষ্টির পরে পরে সে হেঁটে গেছে। এদিকের প্রতিটি ঘাসও ফাটা রহমানের মুখস্ত। সে বলল, আধ মাইলটাক আগে নদীপাড়ের বনে অনেক শটি গাছ আছে। ছেলেবেলাতে আমরাও ওখান থেকে শটি তুলে নিয়ে যেতাম দোলের আগে আবির বানাবার জন্যে। ও ব্যাটা নিশ্চয়ই শটি ক্ষেতের দিকেই গেছে।

—ফাটা রহমানের এই কথা আমাদের দুজনেরই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হল। বালিতে একদল ময়ূর-ময়ূরী, একদল চিত্রল মৃগ আরও একটি বড় অজগর সাপের চলে যাওয়ার চিহ্ন দেখলাম। একটি বড় হায়নারও পায়ের দাগ ছিল।

—তারপর?

—প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটে যাওয়ার পরে আমরা দূর থেকেই দাঁতাল শুয়োরটাকে দেখতে পেলাম। সত্যিই প্রকাণ্ড শুয়োর। এতবড় শুয়োর বড় একটা দেখা যায় না। ব্যাটা এতদিন আমাদের চোখের আড়ালে কি করে ছিল তা ভেবে অবাক হলাম। শুয়োরটা এত বড় ছিল এবং তার দাঁতও এত বড় বড় যে বাঘও তার সঙ্গে চট করে তকরার-এ যেতে সাহস করবে না। ফাটার অনুমানই ঠিক। সে শটি ক্ষেত তছনছ করে শটি খাচ্ছিল। রেঞ্জ এর মধ্যে এ গাছ ও গাছের আড়াল নিয়ে প্রায় নিঃশব্দেই আমরা গিয়ে পৌঁছতেই সনা বন্দুক তুলে নিমেষের মধ্যে গুলি করলো। সনা চিরদিনই খুব কুইক শট। ওর নিশানা টিশানা নেবার দরকার হত না। স্কিট বা ট্র্যাপ শুটাররা যেমন কোমরে বা উরুতে বন্দুক রেখেই নিমেষে গুলি করতে পারে, সনাও বন্দুকে তেমন করেই গুলি করত—তা সে মাটিতে দাঁড়ানো বা চলন্ত জানোয়ারই হোক কি উড়ো পাখি। রাইফেল হলে নিশানা নিতে সামান্য সময় নিত কিন্তু বন্দুকে সে মারতো মুহূর্তেরই মধ্যে। গুলিটা গিয়ে ঠিক কোথায় লাগলো বুঝতে পারলাম না। তবে এটা বুঝলাম যে ভাইটাল

স্পট, মানে কান বা হার্ট বা লাঙ্গসে লাগেনি গুলিটা। শুয়োরটা পড়ে না গিয়ে একটা চরকি মেরেই সামনের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে চার্জ করে এলে আমি ও ফাটা রহমান তাকে ধরাশায়ী করতে পারতাম সহজেই। সনার অন্য ব্যারেলে এলজি ভরা ছিল। কিন্তু নির্ভুল লক্ষ্যের শিকারি সনার গুলি জায়গামতো লাগবে না, আমাদের ভাবনারও বাইরে ছিল। আর সেই মুহূর্তের মধ্যে সে চোখের আড়ালে চলে গেল।

—তারপর?

—তারপর, আমরা সনাকে বললাম নদীর পারে একটা পাথরে বসতে। কারণ কিছুদিন হয় বেশি বিয়ার খেয়ে খেয়ে ও বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিল। ওকে বসতে বলেই আমি আর ফাটা দুজনে একসঙ্গে আহত শুয়োরের খোঁজে বন্দুক বাগিয়ে দৌড়লাম। কিন্তু শুয়োর তখন অদৃশ্য। তবে আমাদের হাত থেকে তার নিস্তার পাবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তার ঝরানো রক্তের হদিশ আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর, নদীটা যেখানে একটা বাঁক নিয়েছিল, আমরা সেই বাঁকের মুখে ঘুরতেই সনাকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা প্রায় আধমাইল যখন ঢুকে গিয়েছি জঙ্গলের ভিতর এবং আশঙ্কা করছি যে দাঁতালটা যে-কোনও মুহূর্তে ঘুরে আমাদের চার্জ করবে, ঠিক তখন পেছনে একটি গুলির আওয়াজ পেলাম। মানে, সনা যেখানে বসেছিল সেই দিক থেকে।

ঋজুদা বলল, কিসের আওয়াজ? বন্দুকের না রাইফেলের?

—বন্দুকের।

—গাদা বন্দুকের না এমনি বন্দুকের?

—এমনি বন্দুকের।

—ঠিক জানেন আপনি?

বারুঙ্গা একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, আপনারা কলকাতাতে থাকেন, এসবের কি বোঝেন আপনারা? দশ বছর বয়স থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরছি,

শিকার করছি, আর আমি জানব না? চিনব না কোন আওয়াজটা কিসের আওয়াজ?

তারপর?

এরই মধ্যে পড়ে বিশ্বল সাহেব বললেন, তুই এঁদের আনাড়ি ভাবিস না গাদু। এঁরা সব শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই ঘুরে বেড়ান। তোর চেয়ে এদের কারও অভিজ্ঞতাই কম নয়। ঋজু তো গিরিধারীদার সঙ্গেও শিকার করেছে—ওর জেঠুমণির সঙ্গে—সেও তোরই মতো দশ বছর বয়স থেকেই।

বারুঙ্গা বলল, সরি। সরি। মত্বে মাফ করি দিয়ন্তু বাবুমানে।

তখন ঋজুদাও চাঁদুদার স্টাইলে বললো, হউ! আগে চালন্তু।

—হউ। বলে, বারুঙ্গা আবার শুরু করল।

—ঐ গুলির শব্দে আমি আর ফাটা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেই আহত শুয়োরকে ফেলে সনার দিকে দৌড় লাগালাম। শুয়োরের উপরে যখন চোট হয়েছে তখন তাকে আমরা খুঁজে বের করবই। অত মোটা ধারে যখন রক্ত পড়ছে তখন চোট ভালই হয়েছে। বেশিদূর সে পালাতে পারবে না। কিন্তু সনা কেন হঠাৎ গুলি করল তার তদন্তটা এখুনি করা দরকার।

—আমরা দুজনে যার যার বন্দুক কাঁধে ফেলে দৌড়লাম। সনা যেখানে পাথরে বসেছিল সেদিকে। কাছাকাছি পৌঁছেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। দূর থেকে দেখি সনা সেই বড় কালো পাথরটার উপর শুয়ে আছে আর তার একটা হাত আর একটা পা পাথর থেকে নিচের বালিতে ছড়িয়ে আছে। আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে পাথরটা। সনার বন্দুকটা নিচে পড়ে আছে।

—আমি আর ফাটা দুজনেই শিকারি। সনার নাড়ি দেখে ফাটা দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, বাবু আউ নাহি।

—তারপর আমরা ওর চারদিকের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি বালির উপরে জুতোর দাগ।

—কি রকম জুতো?

—বাটা কোম্পানির অ্যাম্বাসাডর জুতোর হিল যেমন হয় না, অনেকটা তেমন। মনে হল চারজোড়া পায়ের দাগ। অন্যজনের পায়ে জগিং করে যেমন জুতো পরে, তেমন জুতো।

—তারপর?

—আমি সনার বন্দুকটা তুলে দেখতে যাচ্ছিলাম—অভিজ্ঞ ফাটা আমাকে মানা করল। বলল, পুলিশে খবর দিতে হবে আগে। ফাটা বলল, আমরা খবর দিলে আমরাই ওকে খুন করেছি বলে জেলে ভরে দেবে রে বারুঙ্গা। আমি তো এমনিতেই দাগী। আমি একটা গাছে উঠে বসে চারধারে নজর রাখছি। তুই দৌড়ে যা বামরাতে মেজোকর্তাকে খবর দে গিয়ে। আমি যে তোর সঙ্গে ছিলাম এ কথা ঘুণাক্ষরেও কারকে জানাস না। আমাকে ভরে দিলে ছেলেটা আমার না খেয়ে মরবে।

ঋজুদা বলল, দৌড়ে যাবে কেন? তোমাদের সঙ্গে গাড়ি তো ছিলই।

—হাঃ। গাদু বলল, গাড়ি চালাতে জানি না কি আমি? শুধু গাড়ি ঠেলতে পারি। সনার জিপ কতবার ঠেলেছি। দৌড়ে না গিয়ে আর কি করব।

আমরা গাদু দাসের কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম।

—তারপর?

—তারপর মেজোকর্তা পুলিশে ফোন করলেন। নিজের গাড়ি, একজন ড্রাইভার আর ফুচকুকে আর মহুরিবাবুকে নিয়ে, সঙ্গে পুলিশের জিপে দারোগা এবং আমর্ড পুলিশ নিয়ে, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে এলেন।

সঙ্গে খোঁড়াক্ষণুকে নিলেন না দেখে অবাক হলাম।

ঋজুদা অবাক হয়ে বললো, তখন ক'টা বাজে?

—সাড়ে আটটা ন'টা। দৌড়ে যেতে আমার সময় লেগেছিল তো অনেক।

তারপর বলল, খোঁড়াক্ষণু তো ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজে বাথরুম করেই মেজোকর্তার কাছে চলে আসে। পাছে আর কেউ মেজোকর্তার কাছে

পৌঁছে যায় সেইজন্যে। ও একটা নম্বরি হারামজাদা। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের কথা, সেদিন খোড়াক্ষণু তখনও আসেনি অফিসে।

—তারপর?

—তারপর যেখানে সনা পড়েছিল, পৌঁছে এদিক ওদিকে নানা গাছে তাকিয়েও ফাটাকে খুঁজে পেলাম না কোথাওই। বুঝলাম, ফাটা রহমান কেটে পড়েছে। ভালই করেছে। বনবিভাগ থেকে ওর উপরে অনেকগুলো কেস করেছে। পুলিশ কেসও করেছে। একজন সুদখোর মহাজনকে ঠেঙিয়ে পা ভেঙে দিয়েছিল। না পালিয়ে তার উপায় ছিল না। আমি জানতাম যে ঘোলা জল থিতিয়ে গেলেই ও আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি যতক্ষণ ছিলাম না ততক্ষণ ও কি করলো, না করলো, কিছু দেখতে পেল—না পেল তাও জানা যাবে।

—পুলিশ তো ডেডবডি এবং সনার বন্দুকও নিয়ে গেল। একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলাম যে সনা শুয়োরকে গুলি করতে তার বন্দুকের ব্রিচ খোলেনি রি-লোড করার জন্যে। ওর বাঁদিকের ব্যারেলে এল জি তো পোরাই ছিল, হয়ত সেই জন্যেই। কিন্তু ওর বন্দুকের ফাঁকা কার্তুজটা নদীর বালিতে পড়েছিল।

—তোমার কি মনে হয়?

—এক হতে পারে ও পাথরে বসে ব্রিচ খুলে বন্দুকটা রি-লোড করেছিল হয়তো।

—তা হলে ডান ব্যারেলটা খালি থাকবে কেন? আপনি তো বললেন ডান ব্যারেল খালিই ছিল।

—হ্যাঁ। হয়ত যখন রি-লোড করতে যাবে তখনই কেউ ওকে গুলি করে।

—গুলি কোথায় লেগেছিল?

—কপালে। দু' চোখের মধ্যিখানে।

—কি গুলি দিয়ে মেরেছিল, জানা গেছে?

—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি বেরিয়ে ছিল তা তো দারোগা আর মেজোকর্তাই জানে। তবে কপালের ছোট ফুটো দেখে আমার মনে হয়েছিল এল জি টেল দিয়ে ওকে মারা হয়নি—কোনওরকম বল দিয়েই মারা হয়েছিল।

—কি বল সেটা, কোনও আন্দাজ করতে পারেন?

—না। তবে রোটাক্স, কি লেথাল, কি কনটাক্স, কি স্ফোরিক্যাল—যে কোনও বল দিয়েই মারা হয়ে থাকতে পারে।

—যেই গুলি করুক, সে যদি কপালে গুলি করে মারে তবে সে সামনে এসে গুলি করেছিল। সনাবাবুর মতো ভাল শিকারী ওকে গুলি করার আগেই তো তাকে মেরে দিতে পারতেন। সেই আগন্তুকের পক্ষে অত কাছ থেকে তার কপালে গুলি করা সম্ভব ছিল না।

আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে ওর একটাই এক্সপ্ল্যানেশান হতে পারে ঋজুদা।

—কি?

ঘরশুদ্ধ সকলেই আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

—কি? বল?

ঋজুদা ঋজুদা-অসুলভ অধীর আগ্রহে বলল, বলছিস না কেন?

আমি বললাম, যে বা যারা সনাবাবুকে মেরেছে সে বা তারা সনাবাবুর পরিচিত। যাকে বা যাদের সনাবাবু বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি মৃত্যুর আগে।

ঋজুদা নিভে যাওয়া পাইপটাকে অনেক সময় নিয়ে ধরালো। সেই সময়টুকু ভেবে নিল যা ভাবার। তারপরই বললো, ব্রিলিয়ান্ট। ইওর এক্সপ্ল্যানেশান ইজ কোয়াইট প্রোবাবল।

তারপর বিশ্বল সাহেব এবং গাদু দাসের দিকে চেয়ে ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, পারিজা কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে অথবা বামরাতে বসবাসকারী আর কে কে শিকার করতেন বা জঙ্গলে যেতেন? শিকার না করলেও আজকাল তো জাঙ্গল-লাভার, জাঙ্গল ফোটোগ্রাফারে দেশ ছেয়ে গেছে।

তিতির বলল, তারা সঙ্গে ক্যামেরা নেবে, বন্দুক নেবে কেন?

—ক্যামেরাও নেবে, বন্দুকও নিতে পারে সঙ্গে, সেল্‌ফ প্রোটেকশানের জন্যে। অনেক বড় বড় বন্যপ্রাণী বিশারদরাও তো নেন।

—তাও হতে পারে।

ঋজুদা বলল, গাদুবাবুর সঙ্গে আমাদের আবার বসতে হবে। ফাটা রহমান কি এখানে আছে? মানে, বামরাতে?

—এখন নেই। সে সুন্দরগড়ে গেছে। তবে পরশু ফিরে আসবে।

—এলেই তাকে নিয়ে আসতে হবে গাদুবাবু আমাদের কাছে। ঋজুদা বলল।

তিতির জানতে চাইলো, পুলিশ কি বলল?

বিশ্বল সাহেব বললেন, পুলিশ বলল, এটি পিওর অ্যান্ড সিম্পল আত্মহত্যা। সনা মেন্টাল ডিপ্রেশানে ভুগছিল। তাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানও পুলিশকে জানিয়েছেন যে সে মাত্রাতিরিক্ত সিডেটিভ নিত।

ঋজুদা বলল, মেন্টালি ডিপ্রেসড লোক বড়কা দাঁতাল শুয়োরের পেছনে বন্দুক হাতে দৌড়ে বেড়ায় এরকম ঘটনা আমার বেশি জানা নেই।

বারুঙ্গা বলে উঠল, হউ! আলো শুকিলা সাড়ু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, পুলিশ কারও বিরুদ্ধেই চার্জ ফ্রেম করেনি?

বিশ্বল সাহেব বললেন, না। বললাম না, গাদুকে মারধর করে গাদুর বিরুদ্ধেই কেস দিয়েছিল। শুনলে তো ওকে জামিনে খালাস করেছেন উকিল কৃপাসিন্ধুবাবু। কিন্তু অম্বাও যা জানে না তা হল, আজই দুপুরে কৃপাসিন্ধুবাবু ফোন করেছিলেন আমাকে অফিসে। বললেন, একটা ভাল খবর আছে, পুলিশ গাদুর বিরুদ্ধে কেস তুলে নিচ্ছে। কারণ, সনা যে আত্মহত্যাই করেছিল এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত। ফরেনসিক রিপোর্টও নাকি তাই বলছে।

বারুঙ্গা লাফিয়ে উঠল সোফা থেকে এ কথা শুনে।

অম্বাদেবীও বললেন, এই খবরটা তুমি আমাকে আগে দাওনি দাদা।

—আগে দেবো কি করে। অফিস থেকেই তো এদের কাছে গেলাম। তারপরে এই তো এলাম বাড়িতে। ভাল খবর দেরি করে দিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু খারাপ খবর হাওয়াতে উড়ে আসে।

ঋজুদা বলল, সনাবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে আমরা গাদুবাবু আর ফাটা রহমানের সঙ্গে আলাদা করে বসব পরশু, ফাটা রহমান ফিরলে। প্রয়োজনে একাধিকবার বসব। এখন ফুচকুবাবুর মৃত্যুর কথাটা একটু বলুন তো!

অম্বাবতী বললেন, ফুচকুর শিকারের শখ কখনওই ছিল না, কিন্তু বনের পশুপাখির ছবি তোলার শখ ছিল খুবই। নানা জঙ্গলে যেত সুযোগ পেলেই। ছবিও তুলতো চমৎকার।

—কোন কোন জঙ্গলে গিয়েছিলেন উনি?

—কত নাম বলব? বেতলা, মানাস, নাগারহোল, কানহা, করবেট পার্ক, পেঞ্চ, মেলঘাট, গড়চিরোলি, আলাপল্লী, আন্ধারী-তাড়োবা, নাগজিরা, নামধাপা আরও কত জঙ্গল। বাড়ির এত কাছে অথচ সিমলিপালেই যায়নি কখনও। তাই এবারে গিয়েছিল।

—সিমলিপালের কোথায় গিয়েছিল?

—ছোট বৌমা তো গিয়েছিল সঙ্গে। তারও খুব শখ। নাতনিটাকেও নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে গিয়েছিল চাহালা, তারপরে বড়াইপানি, তারপরে জোরান্ডা এবং চাহালার পথ হয়ে না ফিরে গুড়গুড়িয়া হয়ে ফিরেছিল। গুড়গুড়িয়াতে ছিলও এক রাত। ঐ বাংলোতে নাকি সালিম আলির একটি বড় ফোটো আছে? গুড়গুড়িয়াতেই কামড়েছিল মশা। গিয়েছিল তো তিনজনেই, অথচ দ্যাখো অসুখে পড়ল ওই।

ঋজুদা বলল, আমার তিন তিনবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে। তিনবারই ওড়িশা থেকে ফিরে। দু'বার সিমলিপাল থেকে ফিরে আর একবার লবঙ্গীর জঙ্গল থেকে ফিরে। ওদের বাচ্চাটার যে হয়নি এই বাঁচোয়া।

বিশ্বল সাহেব বললেন, বলো কি? গিনেস বুকে নাম উঠবে তোমার। তিন তিনবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হওয়া সত্ত্বেও এখনও বেঁচে আছো?

দেখছোই তো আছি। তারপরে বলল, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলে বাড়িতে একেবারেই রাখতে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই নার্সিংহোম-এ দিয়ে দিতে হয়। সবসময়ে মনিটরিংয়ের দরকার। জন্ডিস হয়ে গেলেই বিপদ। বিলিরুবিন-এর ওপরে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কিডনি ফেল করে গেলেই সর্বনাশ।

অম্বাদেবী বললেন, আমি তো কত করে বললাম ওদের প্রথম দিন থেকেই। গাদুও বারবার বলেছিল। কিন্তু বারুঙ্গার কথা কে শোনে!

তারপর বিশ্বল সাহেবের দিকে ফিরে বলল, দাদাকেও কতবার বলেছি, বল বৌদিদি? বৌদিদিও বলেছেন দাদাকে।

বিশ্বল সাহেব বললেন, দ্যাখ, তোদের পরিবারে ধনা, মানে মেজোকর্তাই সব। ও যা বোঝে আর কেউই কি তা বোঝে? আমার কথা শুনবে কেন?

—কেন দাদা? ডাক্তার পাণিগ্রাহীও তো নিজে বলেছিলেন। তা ধনা বলল, বাড়িতেই নার্সিংহোম করে দিচ্ছি। নার্স, ডাক্তার সবকিছুরই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। সম্বলপুরের নার্সিংহোমে এ দিলে আমাদের সকলকে তোমাকে ছোট বৌমাকে দু'বেলা বামরা থেকে নার্সিংহোম দৌড়তে হবে। আমি ব্যবসা সামলাবো না এই দৌড়াদৌড়ি করব? তাই বাড়িতেই নার্সিংহোমের সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—তারপর? সম্বলপুরেও তো আপনার নিজের বাড়ি এবং নিজেদের নার্সিংহোমও ছিল।

—ছিলই তো। আমি বলেছিলাম, সম্বলপুর শহরেও তো আমাদের বাড়ি রয়েছে। ক'টা দিন আমরা না হয় সেখানেই থাকব।

—তারপর?

—তারপর আর কি? সম্বলপুরের নার্সিংহোমে নিয়ে গেল ধনা, তখন তো ফুচকুর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছেলেটাকে মেরে ফেলল

ওরা।

ঋজুদা বলল, ওরা মানে?

—ওরা মানে, ধনা আর ক্ষণু ঘোষ। খোঁড়াক্ষণু। সেই তো সবকিছুর মন্ত্রদাতা। ঐ লোকটা যে পারিজা পরিবারের শনি এ কথা ধনা যেদিন বুঝবে সেদিন খুবই দেরি হয়ে যাবে। কত ভাল মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপ আমাদের উপরে পড়ছে, তা কী বলব ঋজুবাবু। মেজোকে ঐ মানুষটা কি যাদু যে করেছে তা বুঝতে পারি না। কি পায় ও? ও না কি লোভশূন্য! চিনাবাদাম খেতে খেতে বামরার পথ দিয়ে হেঁটে যায়! একবেলা খায়, তাও নিরামিষাশী। কোম্পানি গাড়ি দেওয়া সত্ত্বেও সে গাড়ি ব্যবহার করে না—একেবারে পরম পুরুষ। কিসের জন্যে এই জাল ও বিছিয়েছে কে জানে! ওই আমাদের পরিবারের সর্বনাশ। আমার স্বামীও ওকে পছন্দ করতেন না, যদিও খুবই অল্পদিন সে কাজ করেছে তাঁর আমলে।

আমি বললাম, ক্ষণজন্মা ঘোষের আদিবাড়ি কোথায়?

বিশ্বল সাহেব বললেন, ঠিক জানি না। শুনেছিলাম, কটকের কাছে হিন্দোলে ছিল একসময়ে।

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—তাও ঠিক জানি না। বিশ্বল সাহেব বললেন।

বারুঙ্গা একটু অবাক হওয়া গলাতে তাকিয়ে থাকল বিশ্বল সাহেবের দিকে। নিজে মুখে কিছু বললো না।

—ব্যবসার ব্যাপারে না হয় ক্ষণজন্মা ঘোষ মেজোকর্তাকে বুদ্ধি যোগায়। পারিবারিক এই সব ব্যাপারেও সে মাথা গলায়? ঋজুদা অবাক হয়ে বলল।

—গলাবে না! মেজোকর্তার নিজস্ব মাথা বলে আর কিছু আছে না কি? তাঁর মাথা তো তিনি বাঁধা দিয়েছেন ঐ খোঁড়াক্ষণুর হাতেই।

বিশ্বল সাহেবের স্ত্রী তারপর বললেন, আমি নিজে সকাল-বিকেল ফোন করেছি বামরাতে, আমাদের এখানকার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে দিয়ে ফোন

করিয়েছি। তাও ফুচকুকে সময়ে আনল না ওরা সম্বলপুরে। খুন তো নানারকম হয়। এও একরকমের খুনই।

উষ্মার সঙ্গে বললেন মিসেস বিশ্বল। বিশ্বল সাহেব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কি যা তা বলছ পিনা।

—অসুখের ক'দিনের মাথাতে এনেছিল সম্বলপুরে?

ঋজুদা বলল।

অম্বাদেবী বললেন, যেদিন মারা গেল তার আগের দিন রাতে। মাঝরাতে না কি। বিলুরবিন যে এরকম তা ঠিকমতো ধরা পড়েনি। ধনা বলেছিল বটে যে ওখানকার প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির বিরুদ্ধে কেস ফাইল করবে। কিন্তু আমার ছেলেই চলে গেল, কেস দিয়ে আমি কী করব! ফুচকুটার বৌ রিঙ্কির মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারি না আমি। পঁচিশ বছরের মেয়ে। সে এরই মধ্যে এক সন্তান নিয়ে বিধবা। ভবিষ্যতে কি যে হবে ওদের তা ঈশ্বরই জানেন।

বারুঙ্গা বলে উঠল কেস? করবে কে? বামরা ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির মালিক ডাক্তার হ্যাপি মহান্তি তো মেজোকর্তার বেস্ট ফ্রেন্ড। রোজ রাতে একসঙ্গে বসে দু'পাত্তর না চড়ালে ঘুমই আসে না। কি সব ওষুধপত্তরও দেয় মেজোকর্তাকে চুপি চুপি, তারপরে রাত বেশি হলে কিলবগাতে ডাক্তারের এক কর্মচারীর বাড়িতে যান দু'জনে।

—কেন?

—তার একটা ডগমগে বৌ আছে। বলেই, বারুঙ্গা কবিতা আউড়ে দিল, "কঁইথমূলে ম বাসা, বেল বুড়ি গলে নেবু পয়সা"।

বিশ্বল সাহেব বারুঙ্গাকে ধমক দিলেন। তারপর কাজের লোককে ডেকে বললেন, বারুঙ্গাকে ওর ওষুধের দুটো গুলি এনে দে তো, জল দিয়ে। তারপর ওঁকে বললেন, তোর অসুখ বাড়লে তোকে সামলাবে কে?

বারুঙ্গা আপত্তি করে বলল, আমার কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।

—এমন করলে তোমাকে আর আমার বাড়ি আসতে দেব না।

বারুঙ্গা একটা পা নাচাতে নাচাতে বলল, তা নাই বা দিলে। আসবো না। আমি কি আপনার কাছে আসি? মা আর বৌদিদির কাছে আসি।

—মেজোকর্তা কি খুব ড্রিঙ্ক করেন না কি? ঋজুদা জিজ্ঞেস করল। বিশ্বল সাহেব কিছু বলবার আগেই বারুঙ্গা বলল, মেজোকর্তা কি ভাল মানুষ যে বেশি ড্রিঙ্ক করবেন? গুণে গুণে দুটো খান। সন্ধে আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত। যারা গুণে গুণে মদ খায় সে মানুষগুলো মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করতে পারে, লোক ঠকাতে পারে।

ভটকাই বলল, জ্যাঠার মতো। ডাক্তারেরা যে বলেন গুণে গুণে দুটো খেলে শরীর ভাল থাকে। বেশিদিন বাঁচে মানুষে।

—হুঃ। তারা সেরকমই ডাক্তার। খারাপ মানুষদের বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখার দরকারই বা কি? সমাজ-সংসারের কোন উপকারে লাগে তারা? তারা যত তাড়াতাড়ি ফুটে যায় ততই তা ভাল।

ঋজুদা এই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলল, ভটকাই, তুই আবার কবে থেকে এসব ব্যাঁপারে ওয়াকিবহাল হয়ে' গেলি। এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর এবারে।

বিশ্বল সাহেব মনে হল বারুঙ্গার উপস্থিতি বিশেষ পছন্দ করছেন না। বারুঙ্গাকে বললেন, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, খাওয়ার সময়ে ডেকে নেব তোমাকে।

অম্বাদেবী বললেন, ও তো কাল সকালেই চলে যাবে আটটার বাসে। থাকুকই না একটু দাদা। আবার তো আসবে সেই সাতদিন পরে।

বিশ্বল সাহেব বললেন, কেন? সকালের বাসে যাবে কেন? দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বিকেলের বাসেই তো যায়।

—না কাল সকালেই যাবে। ওর নাকি কি কাজ আছে।

অন্যমনস্ক গলাতে বিশ্বল সাহেব বললেন, তাই?

—তাই তো বলছে বারুঙ্গা।

রাতে প্রায় পৌনে এগারোটা। বাংলোর কম্পাউন্ডের বাইরের প্রধান পথ দিয়ে তখন শুধু হু হু শব্দ করে দূরপাল্লার ট্রাক যাতায়াতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ট্রাক তো নয়, যেন এক একটা পাহাড়। কোনও অদৃশ্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বতের মতো তাদের যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনও না-থাকা সাগরপারে। আমরা ঋজুদার ঘরে বসে আছি। ডিনারের বন্দোবস্তে ত্রুটি ছিল না। নানা পদের মধ্যে কিছু পদ অম্বাবতীদেবী নিজে হাতে রেঁধেছিলেন। আবার মিসেস বিশ্বলও। ওঁরা দুজনেই কাল খুব ভোরে মন্দিরে যাবেন, তাই ডিনার তাড়াতাড়িই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সবচেয়ে যা অবাক করেছিল আমাকে তা এই যে ভটকাইয়ের খাওয়াতে মন ছিল না। এবং ঋজুদাও কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিল। আমার আর তিতিরের মনও যে খুব একটা বশে ছিল তা নয়, আমরা সকলেই যে যার ভাবনা ভাবছিলাম। আমাদের বাংলোতে, মানে ডিরেক্টরস বাংলোতে ফিরে ঋজুদা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে, পাইপটা ভাল করে ফিল করে ঘরে এক

পাশে রাখা ইজিচেয়ারটাতে আধো-শুয়ে, পা দুটো সোফার উপরে তুলে দিয়ে বলল, হুম-ম-ম। আলো শুকিলা সাড়ু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু। আমরা সকলেই ঋজুদার কথাতে হেসে উঠলাম।

বিশ্বল সাহেবের বাংলো থেকে আসার সময়ে অম্বাবতীদেবী ঋজুদার হাত দুটি ধরে জলভরা চোখে বললেন, আপনি একটু ভাল করে তদন্ত করুন। আমার দু'দুটো ছেলে এক মাসের মধ্যে চলে গেল! আর আমার স্বামীই বা এমন একটা উদ্ভট উইল কেন করে গেলেন? উনি যে আমাকে খারাপ বাসতেন তাও নয়—তাই আমাকেই বা বঞ্চিত করে গেলেন কেন? তারপর বললেন, আমার তো ব্যবসা নেই। তবে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে লাখ পঁচিশেক টাকা আছে, গয়নাগাটিও কম নেই। আপনার ফিসের জন্যে ভাববেন না। বাকি জীবন আমি আমার দাদা বৌদির কাছেই না হয় থেকে যাব। আমি তো একা মানুষ। নয়তো হরিদ্বারে চলে যাব রামদেও বাবার কাছে। দয়া করে আমার এই উপকারটা করুন, বাবা জগন্নাথ আর মা সমলেশ্বরী আপনাদের ভাল করবেন।

বিশ্বল সাহেব বললেন, তাহলে গুড নাইট টু য়্যু অল। কাল পরশু দুটো দিন একটা সেমিনার নিয়ে ব্যস্ত থাকব আমি, ইনফ্যাক্ট আমাকেই সেমিনার কনডাক্ট করতে হবে। তাই এই দুটো দিন তোমরা নিজেরাই ঘুরে ফিরে দেখো। বামরাতে মেজোশালাকে বলা আছে—কোনওরকম অসুবিধেই হবে না। তাছাড়া ক্ষণু ঘোষ তো তোমাদের সেবাতে লেগে থাকবে সকাল থেকেই। ইচ্ছে করলে খাওয়া দাওয়া দুপুরে এবং রাতে বামরাতেও করতে পারো।

—তা তো তুমি আগেই বলেছ। দেখি কি করি।

ঋজুদার ভাবাবেগ কম। থাকলেও তা বাইরে প্রকাশ করে না সচরাচর। কিন্তু অম্বাদেবীর অসহায় অবস্থা তাকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে মনে হল। ঋজুদাকেও ভারাক্রান্ত দেখাল। অস্ফুটে বলল, কথা দিচ্ছি, যথাসাধ্য করব। পাইপটাতে রনসন-এর লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে আমাকে বলল, দ্যাখ

তো রুদ্র, আমার মোবাইলটা চার্জ হয়েছে কি না পুরো। যাওয়ার সময়ে চার্জে দিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, এতক্ষণ? ওভার-চার্জড হয়ে গেছে। বলেই, প্লাগটা খুলে ঋজুদাকে দিলাম। ঋজুদা স্টোর করা একটা নম্বর টিপলো। ও পাশ থেকে সাড়া পেতেই বলল, কি প্রদীপ শুয়ে পড়েছ না কি? সত্যি করে বলো।... ও ভালই করো। আমিও অফ্ করে শুই কলকাতাতে। তবে বাইরে এলে অন্য কথা। সত্যি। ল্যান্ডলাইন বলে যে একটা ব্যাপার আছে মানুষে তা যেন ভুলেই যেতে বসেছে।...হ্যাঁ, সম্বলপুরে...। বিনানিদের কেসটার কি হল?..., হুঁ। সবাইকেই লাগাও। অনিন্দ্য মিত্র, জয়ন্ত মিত্র এবং অহীন চৌধুরিকেও। তুমি নবী চৌধুরীকে চেনো? ব্যারিস্টার নয় তবে খুব কমপিটেন্ট এবং বিবেকসম্পন্ন উকিল। অ্যাসিস্ট করবার জন্যে তাকেও নিতে পারো।...না, না, আমার কি চিন্তা। দায়িত্ব যখন তোমাকে দিয়েছি।..., না, সে জন্যে ফোন করছি না এত রাতে। আমাকে একটা কথা বল তো!... ইজ ইট নেসেসারি দ্যাট অ্যান উইল শ্যাল নেসেসারিলি বি রেজিস্টার্ড?...নো? ভেরি গুড।

—আচ্ছা, অরিজিনাল উইলের যারা এগজিক্যুটর, ইজ ইট নেসেসারি যে সে যদি কোডিসিল হয় তবে তাদেরই এগজিক্যুটর রাখতে হবে?

—না? ভেরি গুড।

—কি বললে? নর্মালি রাখা হয় তবে কেউ যদি মারা যান এবং আদার ওয়াইজ নন-অ্যাভেইলেবল হন তাহলে অথবা উইলকারি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে যাঁকে খুশি এগজিক্যুটর করা যায়।

—থ্যাঙ্ক য়্যু!

নবীকেই জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবীর লাইনটা পেলাম না। হয়ত বন্ধ করে রেখেছে। ব্যাচেলর মানুষ, পার্টি-ফার্টি করছে বোধহয়। ঠিক আছে প্রদীপ। গুড নাইট। কলকাতাতে গেলে দেখা হবে। এবারে সত্যিই তোমার শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে থাকব ক'দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বর্ষাতেই। বর্ষাতে শান্তিনিকেতন যা সুন্দর অন্য কোনও সময়েই

নয়—একমাত্র দোলের সময় ছাড়া।

কথা শেষ করে ঋজুদা বলল, আমিতো উকিল নই। তাই মনে খটকা ছিল। জেনে নিলাম।

—প্রদীপ কে? ভটকাই শুধোল।

—এস কে সডে অ্যান্ড কোম্পানির প্রদীপ ব্যানার্জি। ওর বাবাকেও আমি চিনতাম। যদিও সডে সাহেবকে আমি কখনও চোখে দেখিনি, জেঠুমণি চিনতেন।

অদ্ভুত পদবী তো! তিতির বলল।

হ্যাঁ। SWADAY ঋজুদা বলল। গভর্নর হাউসের উল্টোদিকে রেড ক্রস স্ট্রিটে ওদের অফিস।

—কোডিসিলটা কি ব্যাপার ঋজুকাকা? তিতির বলল।

—ইন্ডিয়ান সাকসেশন অ্যাক্ট এর দুই এর বি ধারার CODICIL এর ব্যাখ্যা হচ্ছে An instrument made in relation to a will, and explaining, altering or adding less to its depositions, and shall be deemed to form part of a will.

ভটকাই বলল, যারা আইন বানায় তাদের ইংরেজি জ্ঞান এত কম কেন?

—কেন?

—ঐ যে will যেখানে হবে সেখানে shall বলছে।

ঋজুদা হেসে বলল, একেই বলে, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। আইনের ইংরেজি অন্যরকম হয়। কোনও আইনের বয়ানেই will ক্রিয়াপদটি পাবি না। আইনের ভাষায় MAY এবং SHALL ব্যবহার হয়। SHALL হচ্ছে MANDATORY আর MAY হচ্ছে DISCRETIONARY, বোঝা গেল। SHALL বলা হলে তা করতেই হবে বোঝার আর MAY বলা হলে বোঝায় করলেও হতে পারে, না করলেও চলতে পারে।

আমি বললাম, কিন্তু তুমি CODICIL নিয়ে ভাবছ কেন?

—জানি না। আমার মন বলছে গিরিধারী পারিজার উইলটাই শেষ কথা

নয়। উইলটা যে উদ্ভট তাতে তো সন্দেহ নেই। অবশ্য একটা কথা আছে, গিরিধারীবাবু জানবেনই বা কি করে যে ওঁর বড় ও ছোট ছেলের কোনও পুত্র সন্তান হবে না? আজকালকার মেয়েদেরও—বলিহারী যাই। দুটি সন্তান হয়ে গেল তো টিউবোক্টমি করে নিতে হবে! আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা তো বছর-বিয়োনি ছিলেন।

তিতির হেসে ফেলল। বলল, আমরা কি মুলতানি গরু যে আমাদেরও বছর-বিয়োনি হতে হবে?

আমরা তিতিরের কথাতে হেসে উঠলাম।

—না, ঋজুদা বলল, একজন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গিরিধারীবাবু হয়তো ঐ আইনের পরে এবং উনি অ্যালঝাইমার রোগে আক্রান্ত হবার আগে একটি কোডিসিল করে থাকতেও পারেন। বিশ্বল আমাকে উইলের কথাটাই শুধু বলেছে। কোডিসিল এর কথা কিছু বলেনি। না বলার দুটি কারণ হতে পারে। এক, কোনও কোডিসিল ছিল না। দুই, থাকলে, তা গোপন করার কারণ ছিল বলেই তা গোপন করা হয়েছে।

—উইলের এগজিক্যুটর কে কে ছিলেন? তিতির বলল।

—দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্বল নিজে। গিরিজাবাবুর একমাত্র ভগ্নীপতি, উচ্চপদস্থ চাকুরে, দায়িত্ববান, বিশ্বাসযোগ্য।

—আর দ্বিতীয় জন?

—তিনি না কি গিরিজাবাবুর এক ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন। খুবই সরল মানুষ। মধ্যবিত্ত কিন্তু, আপাদমস্তক সৎ, নির্লোভ।

—কি করতেন উনি?

—বিশ্বলের কাছেই শুনেছি, এই ছোটখাটো কাঠের ব্যবসা। পালাম্যুর ডালটনগঞ্জ-এর মোহন বিশ্বাস-এর ছোটকাকা হতেন সম্পর্কে বীরেন বিশ্বাস—তাঁর বামরাতে ব্যবসা ছিল। তাঁরই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনফরম্যাল পার্টনারশিপ-এ।

—তিনি কোথায় গেলেন?

—তিনি না কি গত হয়েছেন গিরিজাবাবুর মৃত্যুর আগেই। তাঁর মৃত্যুটাও একটু আশ্চর্যরকম মৃত্যু।

—ওঁর মৃত্যুটাকে আশ্চর্যজনক বলছ কেন?

—উনি না কি গাছ চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। জঙ্গলের অনেক ঠিকাদারদের আমি জেনেছি—বিহারের, ওড়িশার, আসামের। করাতীদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও সখনও বড় গাছ কাটার সময়ে গাছ যখন মাটিতে পড়ে তখন গাছ চাপা পড়ে মারা যে যায় না তাও নয়। কিন্তু ঠিকাদার অর্থাৎ মালিক নিজে গাছ চাপা পড়ে মারা যাওয়ার কথা শুনিনি কখনওই। কোনও সন্দেহ নেই যে ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক।

ভটকাই ঋজুদাকে নকল করে বলল, হুম-ম্-ম্।

তিতির বলল, তুমি ঐ ভদ্রলোকের মৃত্যুর কথা জানলে কি করে?

—বললাম না, বিশ্বলই বলেছিল। আমি জানব কি করে। ভদ্রলোকের ভাল নাম কি ছিল জানি না, তবে বিশ্বল তাকে হটবাবু বলেই উল্লেখ করেছিল।

—মোহনদার কাকা বীরেন বিশ্বাস বামরাতে কতদিন কাজ করেছিলেন?

—তাও জানি না। তবে বের করা যায়। আমি তাঁর কলকাতার বাড়িও চিনি। শরৎ বোস রোডের শিশুমঙ্গলের পাশের গলিতে তাঁর বাড়ি। কালো লম্বা চওড়া মোটা সোটা হাসিখুশি ভদ্রলোক ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিধারী। ঠিকই বলেছিস। ওঁর কাছ থেকে কিছু তথ্য জানা যেতে পারে। যদি উনি বেঁচে থাকেন।

—এখন কি করণীয় তাই বলো।

—সে কথাই তো ভাবছি।

—তুমি যাই বলো আর তাই বলো তোমার ফ্রেন্ড মিস্টার বিশ্বলকে কিন্তু আমার একটু গোলমেলে মনে হয়েছে।

ভটকাই কথাটা দুম করে বলে দিল। কথাটা আমার মনেও এসেছিল কিন্তু সাহস করে বলতে পারতাম না। আসলে এটা একটা সিক্সথ সেন্স-

এর ব্যাপার। কেন গোলমেলে মনে হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তাঁর স্ত্রী কিন্তু চমৎকার মহিলা।

তিতির বলল, আমিও কিন্তু ভটকাই এর সঙ্গে একমত।

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, আর তুই?

—আমিও। মুখ নিচু করে বললাম, আমি।

ঋজুদা বলল, মানুষকে এত সহজে অবিশ্বাস করতে নেই, বিশ্বাসও করতে নেই। অত সহজেই যদি একজন মানুষকে বাতিল করে দেওয়া যেত তবে তো কথাই ছিল না। বিশ্বল যদি গোলমেলে মানুষই হত তবে কি সে আমাদের এখানে ডেকে আনতো? খাল কেটে কুমীর আনতো? বিশ্বল আমার বন্ধু নয়, অ্যাকোয়েন্টেন্স। ওর ভগ্নিপতী গিরিধারীবাবু জেঠুমণির বন্ধু ছিলেন। মেজোকর্তা সম্বন্ধে যা শুনছি, তাতে বুঝতে পারছি যে বাবার সঙ্গে ছেলের কোনও মিলই নেই। শ্যালকেরও নেই সম্ভবত। তবে এ যাত্রাতে বারুঙ্গা আর খোঁড়াক্ষণু এই দু'জন হাইলি ইন্টারেস্টিং মানুষের খোঁজ পাওয়া গেল, এতটাই মস্ত লাভ।

বলেই বলল, রুদ্র, তোকে কালই হিন্দোলে যেতে হবে। ঐ খোঁড়াক্ষণু সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ভাল করে। এখানে বিধবা বোনের সঙ্গে থাকে আর নিরামিষ খায় এবং অবিবাহিত। ভেক ধরে থাকলেও তার আসল চেহারাটা জানা দরকার। কর্ম হলে তার, পেছনে কারণ থাকবেই। নিষ্কাম কর্ম যে করে, সে অপ্রয়োজনে এত বিনয়ী হয় না। বিনয়ই সদ্বংশজাতর একমাত্র লক্ষণ নয়, অতি বিনয় তো নয়ই! মানুষটা এক নম্বরের ভণ্ড যে সে সম্বন্ধে আমারও কোনও সন্দেহ নেই।

তারপর বলল, আমি এত রাতে সুভাষকে ফোন করবো না ভুবনেশ্বরে। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় করবো।

—সুভাষ কে?

—সুভাষ সেন। এখন ভুবনেশ্বরের আয়কর বিভাগের চিফ কমিশনার ওয়ান। মানে, বনবিভাগ যে পদকে বলে প্রিন্সিপ্যাল চিফ কনজার্ভেটর তাই

এর ব্যাপার। কেন গোলমেলে মনে হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তাঁর স্ত্রী কিন্তু চমৎকার মহিলা।

তিতির বলল, আমিও কিন্তু ভটকাই এর সঙ্গে একমত।

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, আর তুই?

—আমিও। মুখ নিচু করে বললাম, আমি।

ঋজুদা বলল, মানুষকে এত সহজে অবিশ্বাস করতে নেই, বিশ্বাসও করতে নেই। অত সহজেই যদি একজন মানুষকে বাতিল করে দেওয়া যেত তবে তো কথাই ছিল না। বিশ্বল যদি গোলমেলে মানুষই হত তবে কি সে আমাদের এখানে ডেকে আনতো? খাল কেটে কুমীর আনতো? বিশ্বল আমার বন্ধু নয়, অ্যাকোয়েন্টেন্স। ওর ভগ্নিপতী গিরিধারীবাবু জেঠুমণির বন্ধু ছিলেন। মেজোকর্তা সম্বন্ধে যা শুনছি, তাতে বুঝতে পারছি যে বাবার সঙ্গে ছেলের কোনও মিলই নেই। শ্যালকেরও নেই সম্ভবত। তবে এ যাত্রাতে বারুঙ্গা আর খোঁড়াক্ষণু এই দু'জন হাইলি ইন্টারেস্টিং মানুষের খোঁজ পাওয়া গেল, এতটাই মস্ত লাভ।

বলেই বলল, রুদ্র, তোকে কালই হিন্দোলে যেতে হবে। ঐ খোঁড়াক্ষণু সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ভাল করে। এখানে বিধবা বোনের সঙ্গে থাকে আর নিরামিষ খায় এবং অবিবাহিত। ভেক ধরে থাকলেও তার আসল চেহারাটা জানা দরকার। কর্ম হলে তার, পেছনে কারণ থাকবেই। নিষ্কাম কর্ম যে করে, সে অপ্রয়োজনে এত বিনয়ী হয় না। বিনয়ই সদ্বংশজাতর একমাত্র লক্ষণ নয়, অতি বিনয় তো নয়ই! মানুষটা এক নম্বরের ভণ্ড যে সে সম্বন্ধে আমারও কোনও সন্দেহ নেই।

তারপর বলল, আমি এত রাতে সুভাষকে ফোন করবো না ভুবনেশ্বরে। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় করবো।

—সুভাষ কে?

—সুভাষ সেন। এখন ভুবনেশ্বরের আয়কর বিভাগের চিফ কমিশনার ওয়ান। মানে, বনবিভাগ যে পদকে বলে প্রিন্সিপ্যাল চিফ কনজার্ভেটর তাই

পয়েন্ট। এই গাদুর ওপরে আমাদের অনেকখানি ভরসা করতে হবে। আর একটা কথা, ফাটা রহমানের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। এবং অসম্ভব না হলে গাদু এবং ফাটা রহমানকে নিয়ে আমার এখানে চলে আসবি।

—আজ রাতেই?

—আজ রাতে এলে তো ভালই, নইলে ফাটাকে না পেলে কাল সকালে আসবি।

—ঠিক আছে।

আমি বললাম, আমাকে কোনও কাজ দেবে না?

—দিলাম তো। ব্যাপারটা আর্জেন্সির কথা বিবেচনা করে সুভাষকে আমি অনুরোধ করব ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে তোকেও যেন যেতে দেন। তাহলে ভায়া ভুবনেশ্বর হয়ে তোকে ফিরতে হবে না। হিন্দোল থেকে বাসে অঙ্গুলে এসে সেখান থেকে রেঢ়াখোল হয়ে সম্বলপুরে চলে আসবি। অঙ্গুল থেকে ট্রেনেও আসতে পারিস।

তিতির বলল, আমি কি এখানে দর্শনধারী হয়ে এসেছি? আমাকে কোনও কাজই দেবে না?

—দেব। অবশ্যই দেব। তুই কটকে গিয়ে দণ্ডপাণি পাণিগ্রাহীর সঙ্গে দেখা করবি।

উনি কে?

উনি কটকের অত্যন্ত নামী ও সিনিয়র সলিসিটর এবং অ্যাডভোকেট। উনি জেঠুমণির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন গিরিধারী পারিজা, মানে বিশ্বলের ভগ্নিপতীরই মাধ্যমে। পাণিগ্রাহী সাহেব গিরিধারীবাবুর খুবই বন্ধু ছিলেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গিরিধারী যদি উইল এবং তার পরে কোডিসিলও করে থাকেন, তবে তা পাণিগ্রাহী সাহেবকে দিয়েই করিয়েছিলেন। জানি না উনি বেঁচে আছেন কি না। তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

—উনি কি বিশ্বল সাহেবকে চিনতেন?

—চিনতেন হয়তো। উনি তো অম্বাবতীর বড়।

জেঠুমণিকে গিরিধারীবাবু বিয়েতে নেমন্তন্নও করেছিলেন। তবে, শ্যালকের সঙ্গে আলাপ করিয়েছিলেন কি না। জানা নেই।

—দণ্ডপাণিবাবুর ঠিকানা কি করে পাব?

—এস এন রোথো সাহেবের কাছ থেকে। তাঁর বাড়ি ও চেম্বার কটকের বজ্রকপাটি রোড-এ। উনি ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের মেম্বার ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের পরে কটকেই প্র্যাকটিস করছেন। জেঠুমণির খুবই পরিচিত ছিলেন। সেই সূত্রে ছেলেবেলা থেকে আমাকেও চেনেন। পাণিগ্রাহী অ্যান্ড কোম্পানি ওঁকে নিয়মিত ট্রাইব্যুনালের ব্রিফও দিত। হয়তো আজও দেয়। তবে এখন ওঁরও বেশ বয়স হয়ে গেছে নিশ্চয়। যাই হোক, সবাইকেই আমি চিঠি দিয়ে দেব।

—যদি পাণিগ্রাহী সাহেব উইল বা কোডিসিলের ব্যাপারে না জানেন বা যদি উনি গত হয়ে থাকেন। তিতির বলল।

—গত হতেও পারেন! তবে চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। উনি যদি গতও হয়ে থাকেন, তবুও ওঁর ফার্ম তো থাকবেই। তোর মতো সুন্দরী স্মার্ট মেয়েকে সাহায্য করবে না এমন পুরুষ এ পৃথিবীতে নেই। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সেই জন্যেই তোকে এই কাজের ভারটা দিলাম।

ভটকাই বলল, আর তুমি কি করবে?

—আমি? কুরুবকের বনে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি-ভেজা রূপ দেখব বিয়ার খেতে খেতে। আর পাইপ। সারা জীবন অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছি। আমি যদি এখনও কাজ করি তবে তোদের হাতে ধরে তৈরি করলাম কেন? মিস্টার খোঁড়াক্ষণু ওরফে ক্ষণজন্মা ঘোষের কোম্পানিতে যে তোরা আমাকে রেখে যাচ্ছিস, এর চেয়ে বড় শাস্তি আমার আর কি হতে পারে?

ভটকাই বলল, লোকটা একটা রিয়্যাল খচ্চর। তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছো কি যে লোকটার বুকে একটাও চুল নেই।

তিতির বলল, হাউ ফানি।

—হ্যাঁ, জামার উপরের তিনটি বোতামই খোলা ছিল। বুকে চুল যে নেই তা লক্ষ্য করেছি। অথচ যে পুরুষদের বুকে চুল থাকে তারাই বোতাম খোলা রেখে তা দেখায়, বিশেষ করে মেয়েদের।

—কিন্তু বুকের চুল থাকা-না-থাকার সঙ্গে মানুষের ভালমন্দর কি সম্পর্ক?

—বলছ কি তুমি তিতির! তুমি কতটুকু জানো? একে খোঁড়া, তায় বুকে চুল নেই, এর চেয়ে ডেঞ্জারাস মানুষ আর হয়ই না।

আমি আর তিতির ভটকাই এর কথা শুনে হেসে উঠলাম।

ভটকাই ঋজুদাকে মুরুব্বী ধরল, বলল কি ঋজুদা? তুমি কিছু বলো।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে পাইপে দুটি টান লাগিয়ে বলল, হিন্দিতে একটি কহাবৎ আছে এ ব্যাপারে।

—কি কহবৎ?

"ল্যাংড়া কহে পুকার,
কঞ্জাসে রহ হুঁশিয়ার
কঞ্জা কহে পুকার
আচায়তানা সে রহ হুঁশিয়ার
ঔর আচায়তানা কহে পুকার
উসসে রহো হুঁশিয়ার
যিস কে ছাতিমে নেহি একো বার"।

—মানে কি হল? আমরা সমস্বরে বললাম।

—মানে হল, খোঁড়া চেঁচিয়ে বলছে, কেউ খোঁড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলেছিল নিশ্চয়ই, তারই উত্তরে, খোঁড়া নিয়ে ভয় নেই, যার চোখ কটা তাকে নিয়েই ভয়। যার চোখ কটা, তার থেকে সাবধান। তাই শুনে কটা চোখ বলছে, কটা চোখকে ভয় পাবার কিছুই নেই। যার চোখ ট্যারা, আসল ভয় তাকে নিয়েই। তাই না শুনে ট্যারা বলছে, আসল বিপদ ট্যারার থেকে নয়, যার বুকে একটিও লোম নেই সেই হচ্ছে সবচেয়ে

বিপজ্জনক।

ভটকাই বলল, তবে। দেখলে তো! ঋজুদা জানে। একেই বলে এক্সপিরিয়েন্স। খোঁড়াক্ষণু একে খোঁড়া, তার উপরে বুকে একগাছিও চুল নেই। তার উপরে অতি বিনয় তো আছেই। হাইলি ডেঞ্জারাস ক্যারেকটার।

ঋজুদা বলল, প্রায় পৌনে একটা বাজে। সকালে উঠেই চা আর লাইট ব্রেকফাস্ট করে তোরা তিনজনই বাবুলি বেহারাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবি। ভটকাইকে বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে তোরা দু'জনে সোজা চলে যাবি ঝাড়সুগুদা স্টেশনে। সেখান থেকে যে ট্রেন পাস, তবে এক্সপ্রেস বা মেল ট্রেনই ধরিস, সময় কম লাগবে, দু'জনেই চলে যাবি। একই ট্রেন কটকে ও ভুবনেশ্বরে যাবে। যার যার পিস্তল সঙ্গে রাখবি। আর আমাকে ব্রিফকেসটা দে তো, টাকা বের করে দি তোদের।

ব্রিফকেসটা দিতে, নম্বর ঘুরিয়ে লক খুলে করকরে নতুন পাঁচশ টাকা এবং একশো টাকার বাণ্ডিল বের করে বলল, তিনজনেই দশ করে রাখ। পাঁচ দিলাম পাঁচশ টাকার নোটে আর পাঁচ একশ টাকার নোটে। সব খরচের হিসেব রাখবি এবং ভাউচার, রসিদ ইত্যাদি। রি-ইমবার্সমেন্ট এর জন্যে সব প্রমাণের প্রয়োজন আছে তো। মক্কেলকে সব হিসেব তো দিতে হবে।

—আমাদের মক্কেল কে? বিশ্বল সাহেব?

—কি করে বলব। পরে হয়তো দেখা যাবে সে মক্কেল নয় বিক্কেল।

—তাহলে মক্কেল কে? অম্বাবতী দেবী?

—এখন মক্কেলের চিন্তা ছাড়। শুয়ে পড় এবারে। কপাল ভাল হলে তোরা তিনজনেই কালই রাতে, হয়তো বেশি রাতে ফিরে আসতে পারবি। যদি ফিরতে না পারিস তবে ন'টা নাগাদ আমাকে একটা ফোন করিস। তাহলে আমি তোদের সঙ্গে ডিনার খাবার জন্যে বসে থাকব না। ঠিক আছে। গুড নাইট। বেস্ট অফ লাক।

তারপর বলল, যাকে যাকে চিঠি দেবার আমি আমার প্যাডে লিখে রাখবো। তোরা প্রত্যেকেই যাঁদের কাছে যাবি, তাঁদের ল্যান্ড লাইন,

মোবাইল এবং ফ্যাক্স এর নাম্বার নিয়ে আসবি। ই-মেইল থাকলে ই-মেইল এর হদিশও। ঠিক আছে?

—ঠিক আছে। আমরা সকলেই বললাম। উঠছি আমরা। গুড নাইট ঋজুদা।

বলে, আমরা যার যার ঘরে চলে গেলাম। আমি আর ভটকাই একই ঘরে আছি যেমন থাকি। তিতির মেমসাহেব অন্য ঘরে।

ভুবনেশ্বরে যখন আমি পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। তিতির আমার অনেক আগেই কটকে নেমে গিয়েছিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভুবনেশ্বরের ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে পৌঁছে সি সি আই টি-ওয়ান সুভাষ সেন সাহেবের লাল আলো লাগানো ঘরের উর্দিপরা বেয়ারাকে নিজের নাম লিখে, ঋজুদার রেফারেন্স দিয়ে স্লিপ পাঠালাম। সেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিলেন। হেসে বললেন, ঋজুদা কেমন আছে? বহুদিন দেখা নেই। শেষ দেখা হয়েছিল নাগপুর এয়ারপোর্টে। কলকাতার ফ্লাইট কুয়াশার জন্যে অনেক ডিলেড ছিল। অনেকক্ষণ গল্প হয়েছিল। কিন্তু তারপর বললেন, ঋজুদার কাজ কতোটা অনুরোধানুসারে আমি কতদূর কি করতে পারব জানি না। ঋজুদার ফোন পেয়েই আমি অঙ্গুলে বলে দিয়েছি। সেখান থেকে শ্যামসুন্দর বেহারা নামের একজন ইন্সপেক্টর হলুদ হাওয়াইন শার্ট পরে হিন্দোলে গিয়ে এনকোয়ারি করবেন। আজ উনি হলুদ রঙা জামা পরে অফিসে এসেছেন। তবুও তোমার চেনার সুবিধে হবে বলেই উল্লেখ করলাম। তবে হিন্দোলে

যাবার আগে তিনি অঙ্গুলের অফিসেই কে ঘোষের স্ট্যাটাস সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন। তবে আমরা তো ডিটেকটিভ নই। আমি ডি জি ইন্সপেকশানের সঙ্গেও কথা বলেছি। উনিও একজন এ ডি আইকে বলে দিয়েছেন ব্যাপারটা দেখতে। তুমি চা খাও, চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ো। তুমি অঙ্গুলেই চলে যেও। তারপর সেখান থেকে বাস ট্রেন বা ট্যাক্সি ধরে সম্বলপুরে ফেরো। দেরি করো না, বেস্ট অফ লাক। বেহারা সাহেব এনকোয়ারি সেরে অঙ্গুলে ফিরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। তুমি আগে পৌঁছলে, এন নায়েকের সঙ্গে দেখা করবে এবং বেহারা সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করবে।

আমি চা খেয়ে ওঁকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসছিলাম। উনি পেছন থেকে ডেকে বললেন আমি কিন্তু তোমার লেখা ঋজুদা-কাহিনীগুলির খুবই ভক্ত। ঋজুদাকে তুমিই তো বিখ্যাত করে দিয়েছ।

আমি মনে মনে গর্বিত হয়ে লাজুক লাজুক মুখ করে বললাম, না, না আমি কি করেছি! থ্যাঙ্ক য়্যু।

ভুবনেশ্বর থেকে কটক, হিন্দোল হয়ে অঙ্গুলে যেতে অনেকেই সময় লাগলো। যখন পৌঁছলাম গিয়ে অঙ্গুলের ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে তখন প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। হলুদ হাওয়াইন শার্ট পরা বেহারা সাহেব ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল কমিশনার এন এন নায়েকের ঘরের সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। আমি ওঁর কাছে গিয়ে পৌঁছতেই বললেন, দুপুরে খেয়েছেন কিছু?

আমি বললাম, না। তবে খাওয়ার দরকার নেই।

উনি বললেন, খানই যখন নি তখন চলুন অঙ্গুলে আপনাকে ফার্স্টক্লাস বিড়ি-বড়া আর দোসা খাওয়াব। উঠুন গাড়িতে উঠে পড়ুন।

—আমি যে কাজে এসেছিলাম?

—সে কাজ আমি করে রেখেছি।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করতেই উনি বললেন, ভাগ্যিস আপনারা সেন

সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এই কে ঘোষ মানুষটি তো ক্ষণজন্মা মশাই।

—তাঁর নামই তো ক্ষণজন্মা।

—বলেন কি? তাই?

তারপর বললেন, বাঙালিও যে এমন নিপুণ চোর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। ভদ্রলোক বেনামিতে, মানে ছোট ভাইয়ের নামে, একটি পেপার মিল করেছেন হিন্দোলে। এছাড়াও দুটি করাত কল আছে ওঁর ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর নামে। এ ছাড়াও কাঠের ব্যবসা আছে মস্ত বড়, তাঁর স্ত্রীর নামে। স্ত্রীর নামে বড় গয়নার দোকানও আছে। অথচ তাঁর নিজের স্যালারি ইনকাম ছাড়া অন্য কোনও ইনকাম-এর উপরে ট্যাক্স দেন না। ওঁদের অবস্থা অতি সাধারণ ছিল দশ বছর আগেও। ওঁর বাবা খগেন ঘোষ হিন্দোলে নন্দু পট্টনায়েকের মহাজনী দোকানে খাতা লিখতেন। ওঁর স্ত্রী ও দুই ভাই হিন্দোলেই থাকেন।

—স্ত্রী? অথচ বামরার সকলে জানে যে উনি অবিবাহিত।

—পারিজা কোম্পানিকে চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছেন উনি। তবে ওঁর দিন এবারে শেষ হবে। সি আই টি এবং ডি জি ইনসপেকশান যা যা স্টেপ নেবার নিচ্ছে। এত বছর ওঁর বিরুদ্ধে অ্যাকশান কেন নেওয়া হয়নি, সে বিষয়েও তদন্ত করা হবে। আমাদের কিছু অফিসারও নিশ্চয়ই হাত মিলিয়েছেন ওঁর সঙ্গে।

—আপনি ঠিক জানেন যে উনি বিবাহিত?

—ঠিক জানি। তাঁর বড় ছেলে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে পড়ে। সেও কমার্স নিয়েই পড়ছে। বাবার মতো চোর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবেন। অন্য সমস্ত প্রফেসানেই যেমন খুঁজলে ব্ল্যাক শিপ পাওয়া যায়, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের মধ্যেও তেমনই পাওয়া যায়।

—উনি হিন্দোলে আসেন না?

—আসেন। বছরে দিন পনেরোর জন্যে। দিন তিনেকের জন্যে রজ

উৎসবের সময়ে আর দিন দশেকের জন্যে পুজোর সময়ে। রজ তো পড়েছে সামনের সপ্তাহেই। উনি তখন আসবেন। ঐ সময়েই তাঁকে এবারে আমরা গ্রিল করব। সেটলমেন্ট কমিশনে গেলে বাঁচতেও পারেন কোনওক্রমে, নইলে এবারে ওর সুখের দিন শেষ হবে।

—পারিজাদের কোম্পানির মেজোকর্তা তো খুবই হুঁশিয়ার মানুষ। ক্ষণজন্মা ঘোষ চুরিটা করেন কি ভাবে?

—চুরি কতভাবে করা সম্ভব। যত পারচেজ হয়, তা থেকে কাট মানি নিতে পারেন। পেমেন্টের সময়ে পয়সা নিতে পারেন—নইলে বিল পেমেন্ট না করে পার্টিদের হ্যারাস করতে পারেন। অ্যাকাউন্টস এ কারচুপি করে মালিককে ব্ল্যাকমেল করেও বহু টাকা বানাতে পারেন। যে এলেমদার চোর হয়, তাকে সমুদ্রের ঢেউ গোনার অ্যাসাইনমেন্ট দিলেও তিনি দু'বছরে বাড়ি গাড়ি করে ফেলতে পারেন। ওঁরা সব ক্ষণজন্মা মানুষ হন। অ্যাসেসিদের মধ্যে যেমন এরকম ক্ষণজন্মা মানুষ পাওয়া যায়, সরকারি নানা ডিপার্টমেন্টেও অমন ক্ষণজন্মা আছে। আর এই কে ঘোষ তো নামেও ক্ষণজন্মা। এমন মহিমাময় নামের এমন কর্মময় উদাহরণ বড় একটা দেখা যায় না।

তারপর বেহারা সাহেব বললেন, শ্রীযুক্ত ঋজু বোসকে বলবেন আরও কিছু জানতে হলে আমাকে ফোন করবেন। এই আমার কার্ড, ল্যান্ড লাইন এবং মোবাইল নাম্বার।

তারপর বললেন, শ্রীযুক্ত ঋজু বোস নিজে কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট?

আমি হেসে বললাম, না। তবে তিনি সব্যসাচী। তাচ্ছিল্য করে বললে বলতে হয় সবজান্তা। অনেকে বলেনও। কিন্তু সত্যি সত্যিই বলছি উনি 'JACK OF ALL TRADES নন, সত্যিই MASTER OF ALL TRADES! আমরা ওঁকে যতই দেখি ততই মুগ্ধ হই।

অঙ্গুলের দোকানের বিড়ি-বড়া আর দোসার সত্যিই তুলনা নেই। খাইয়ে দাইয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এনে আমাকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে দিয়ে বললেন,

সম্বলপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে আপনার সাড়ে দশটা এগারোটা হয়ে যাবে, যদি পথে খুব বৃষ্টি না পান। দারুণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে পথটি। যাঁরা জঙ্গল ভালবাসেন না, তাঁদের কাছে ভয়াবহ। আর যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের কাছে মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে, রেঢ়াখোলের জঙ্গল। আমি নিজে জঙ্গলের ভক্ত। শ্রীযুক্ত ঋজু বোস এর নানা কাহিনী আমার পড়া। রুদ্র রায়ের জবানীতে বলা সে সব গল্প।

আমি বললাম, আমিই রুদ্র রায়।

বেহারা সাহেব সত্যিই উত্তেজিত হয়ে বললেন, বলেন কি মশায়! মশায় নয় 'স্যর'! আজকে আমার ভারী সৌভাগ্য বলতে হবে।

—বাংলা পড়তে পারেন আপনি?

—অধিকাংশ শিক্ষিত ওড়িয়াই বাংলা পড়তে পারেন।

শুনে আমার লজ্জা হল। ওঁরা বাংলা পড়েন। অথচ আমাদের মধ্যে খুব কমই আছি যাঁরা ওড়িয়া পড়তে বা বলতে পারি। ঋজুদা একটা কথা প্রায়ই বলে, বলে যে বাঙালিরা কূপমণ্ডুক। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশীদের কখনও সম্মান করেননি, তাঁদের জানেননি, ভালবাসেননি। এবং আজকে তাই প্রতিবেশীরাও আর বাঙালিদের সম্মান করেন না, আগে যেমন করতেন।

রেঢ়াখোল-এ পৌঁছে ঋজুদাকে মোবাইল এ ফোন করলাম।

ও প্রান্ত, থেকে ঋজুদা বলল, বল কি খবর?

—দারুণ খবর। তোমার খিদে পেলে খেয়ে নিও। তবে সম্ভবত আমি তাড়াতাড়ি হলে দশটা আর দেরি হলে এগোরোটাতে পৌঁছবো।

তারপর ভটকাই এর অসৎসঙ্গে চরিত্র হারিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আজকের মেনু কি? ডিনারের?

একটা চাপা হাসি হাসল ঋজুদা। তারপর বলল, ইউ ট্যু ব্রুটাস! তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, একেবারেই বাঙালি মেনু। মুগের ডালের, ভুনি নয়, ঘন খিচুড়ি। কড়কড়ে করে আলু ভাজা, পেঁয়াজি, খাসির সিনা ভাজা, ভাল করে ক্র্যাম দিয়ে। শুকনো লঙ্কা ভাজা। আর ডেজার্ট বলতে, ওড়িশার

সেলিব্রেটেড পোড়-পিঠা।

—ফার্স্ট ক্লাস। আমি বললাম।

তারপর বললাম, ওদের কি খবর?

—তিতিরও ফিরে আসছে সাড়ে দশটার মধ্যে।

—কিছু পারল করতে?

—বলিস কি! একেবারে ভিনি-ভিডি-ভিসি।

তারপর বলল, ওর জন্যে বাবুলি বেহারা গাড়ি নিয়ে ঝাড়সুগদা স্টেশনে চলে গেছে।

—আর ভটকাই? তার কেসটা কি?

—অ্যাজ ইউজুয়াল, কোয়াইট কমপ্লিকেটেড। জট খুলতে সময় লাগবে। তবে সেই গোয়েন্দা গ্রেট ভটকাই ফিরবে কাল সকালের বাসে, অ্যাকম্প্যানিড বাই বারুঙ্গা অ্যান্ড ফাটা রহমান। ও না কি অনেক গরম গরম খবর নিয়ে আসছে। তাছাড়া আমরা, ভটকাইতো বটেই, বারুঙ্গা আর ফাটা রহমানের কাছ থেকেও অনেক কিছু জানতে পারব।

—রাতে থাকবে কোথায় ভটকাই? পারিজা কোম্পানির গেস্ট হাউসে?

—না, না। রাতটা নাকি মেধেশ্বরের মন্দিরের কাছে একটি বহু পুরনো ভেঙ্গে পড়া বনবাংলোতে কাটাবে। সেখানে, ভাগ্যে থাকলে পেত্নীদর্শনও নাকি হবে তার আজ রাতেই। তবে চিন্তার কিছু নেই, সঙ্গে বারুঙ্গা এবং ফাটা রহমান দুই স্থানীয় মাস্তানও থাকবে।

—বাঃ। দারুণ ব্যাপার তো।

তারপরে বললাম, কিন্তু পেত্নীর খপ্পরে পড়ে সে বিগড়ে না যায়। মাথার গোলমালও হয়ে যেতে পারে। চারদিকে এত মেন্টাল কেস!

ঋজুদা হেসে বলল, ও.কে.। তারপর বলল, তোদের আর তিতিরের বাথরুমের গিজার 'অন' করে দিতে বলছি। এসে নিশ্চয়ই চান করবি।

—করলে ভাল হয়।

—যা ভাল হয় তাই তো করা উচিত।

সম্বলপুরে যখন ফিরলাম তখন সেখানে তুমুল বৃষ্টি। অঙ্গুল থেকে রেঢ়াখোল হয়ে সম্বলপুর পর্যন্ত পুরো পথটাই প্রায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসেছে। প্রথম বর্ষাতে সে বনের যে কি সৌন্দর্য কি বলব। সাধে কি এখানে কুরুবকের মেলা! এই ফিরে আসাটা একটা বড় সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকলো।

মহানদী কোলফিল্ডস এর ডিরেক্টরস বাংলোতে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমি যখন বাংলোতে ঢুকলাম, তখন তিতির দোতলার ল্যান্ডিং থেকে বলল, সোজ চানে যাও। তারপরে আমরা তিনজনে খেতে বসব। খাওয়ার পরে ঋজুদার ঘরে নোটস এক্সচেঞ্জ করবো আমরা।

—যা বলবে। বলে, আমি আর তিতির তিতিরের ঘরে গেলাম। চান হয়ে যেতেই তিনজনে নিচের ডাইনিং রুম-এ গিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর ঋজুদার ঘরে এসে ঢুকলাম।

ঋজুদা বলল, তুই বল রুদ্র, তোর যা রিপোর্ট করবার।

আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব বললাম ঋজুদাকে—সেন সাহেবের কাছে যাওয়া থেকে বেহারা সাহেব আমাকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে নিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত আমার বলা শেষ হলে, ঋজুদা স্বগতোক্তির মতো বলল, আই থট অ্যাজ মাচ। দেখা যাচ্ছে প্রবাদ বাক্যটি সত্যি।

—কোন প্রবাদ বাক্য?

"আচায়তানা কহে পুকার, উসসে রহো হুঁশিয়ার, যিসকে ছাতিমে নেহি একো বার।"

আমি আর তিতির হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, একটা রহস্য না থাকলে আজকের দুনিয়াতে খোঁড়াক্ষণুর মতো দিবারাত্র মালিকের নিঃস্বার্থ সেবা করে পথ দিয়ে চিনাবাদাম খেতে খেতে হেঁটে যাওয়া এমন সন্ত প্রকৃতির মানুষের দেখা মেলা ভার। কিন্তু এই ভাবমূর্তি যদি সত্যি প্রমাণিত হতো, তাহলে কত আনন্দের ব্যাপার

হতো, বল তো? সারা পৃথিবী থেকেই ভালত্ব কি উবে যাচ্ছে?

আমরা চুপ করে রইলাম। তারপরে ঋজুদা বলল, এবারে বল তিতির। তুই কি মণিমুক্তো তুলে নিয়ে এলি কটক থেকে?

তিতির বলল, ওঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু চমৎকার মানুষ আর তোমার জেঠুমণিকে ওঁরা কি সম্মানের চোখে যে দেখেন তা কি বলবো!

—সম্মান করার মতো মানুষ ছিলেন যে জেঠুমণি। যাঁর সঙ্গে তাঁর একবার আলাপ হত, তিনিই সারাজীবনের বন্ধু হয়ে যেতেন। একজন মানুষের মধ্যে অত পরস্পরবিরোধী গুণ জেঠুমণির মতো কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি। জেঠুমণি বলতেন, বিজনেস বল, প্রফেসান বল, সবই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক। টাটা গ্রুপ এর অফিসারদের জন্যে একসময়ে একটা ছোট বই ওঁরা সার্কুলেট করতেন—তখন তো 'ম্যানেজমেন্ট' শব্দটার এত রবরবা ছিল না—সেই বইটার নাম ছিল, "বিজনেস ইস পিপল"। অন্য মানুষের সঙ্গে ব্যবহারই ব্যবসা বা পেশায় উন্নতি করবার প্রথম কথা। তারপরই বলল, থাক এখন জেঠুমণির কথা। সে সব কথা শুরু করলে শেষ হবে না। এবারে ওদের কথা বল? কি হল?

—রোথো সাহেব এখন আর কাজে বেরোন না। তবে তোমার চিঠি পড়েই পাণিগ্রাহী কোম্পানিতে ফোন করলেন, তোমার এবং আমার কথা বললেন। পাণিগ্রাহী সাহেব তো বহুদিন হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর ছেলেরা এবং এক নাতিই ফার্ম চালায়। নাতিটা, রোথো সাহেব বললেন, খুবই শার্প হয়েছে। পুণে থেকে আইন পড়ে, ইংল্যান্ডেও গিয়ে ব্যারিস্টারি করে এসেছে।

—তোকে পাণিগ্রাহী সাহেবের নাতির কথা এমন সাতকাহন করে বলার কারণ কিছু বুঝলি?

তিতির বলল, না তো।

আমি বললাম, ন্যাকামি কোরো না। খুব ভালই বুঝেছ।

ঋজুদা হাসি হাসি মুখে আমাকে বলল, কি কারণ রে রুদ্র?

আমি বললাম, সে আমি কি করে বলব।

তিতিরও হাসি হাসি মুখে বলল, তোমরা কি আমার কথা সিরিয়াসলি শুনবে, না এইভাবে অবান্তর প্রসঙ্গে সময় নষ্ট করবে?

ঋজুদা বলল, না না, বল।

—রোথো সাহেব নিজে পথে নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ওড়িয়াতে সলিসিটরস পাণিগ্রাহী কোম্পানির অফিসের ডিরেকশান দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, গিভ ঋজু মাই রিগার্ডস অ্যান্ড টেল হিম টু মিট মি ওয়ান্স। য়্যু শ্যুড ওলসো কাম এগেইন।

পাণিগ্রাহী কোম্পানির অফিসে গিয়ে তো আমি অবাক। আমি কলকাতার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, হেস্টিংস স্ট্রিট এবং হাইকোর্টের সামনের পথটির দু'তিনটি সলিসিটর্স ফার্মেও গেছি। আমার মামা-দাদুর সম্পত্তির মামলার ব্যাপারে। ইদানীং অবশ্য অনেক উন্নতি হয়েছে বলে শুনি, কিন্তু তখনও সেই সব ফার্মের অধিকাংশই মান্ধাতার বাপের আমলে পড়ে ছিল দেখেছি। পাণিগ্রাহী কোম্পানিতে ঢুকেই মনে হলো, ঋজুদা ঠিক জায়গাতেই পাঠিয়েছে। ঝকঝক তকতক করছে অফিস। প্রতি টেবলে একটি করে কমপিউটার। পার্টনারদের চেম্বার সারি সারি। স্মার্ট, সুন্দরী রিসেপসানিস্টকে গিয়ে নাম বলতেই সে নিয়ে গেলো একটি চেম্বারে। দরজাতে নাম লেখা 'ধনদ পাণিগ্রাহী'।

তারপর বলল ধনদ মানে কি ঋজুদা?

—ধনদ মানে জানিস না? ধনদাতা, কুবের।

—ও! ঘরে গিয়ে ঢুকতেই একজন ইয়ং ভেরি হ্যান্ডসাম কালো কোর্ট পরা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে বসিয়ে নিজে বসলেন। জোর করে স্প্রাইট আনালেন। পরিচয় দিলেন, ইনি হর্ষদ পানিগ্রাহী, সিনিয়র পানিগ্রাহীর নীতি।

কোক, থামস আপ, পেপসি থাকতে হোয়াই স্প্রাইট? আমি বললাম।

তিতির হেসে বলল, "দিখাওমে মত যাও, আপনা দিমাগ লাগাও।"

আমি আর ঋজুদা হেসে ফেললাম।

আমার কাছে সব শোনার পর হর্ষদ তার পি এ-কে ডাকল। ডেকে বামরার গিরিধারী পারিজার ফাইল চাইলো। এত বছর পরেও পাওয়া যাবে কি ওঁর ফাইল?

হর্ষদ হেসে বলল, আমার দাদু ভাল চোখের ডাক্তার বা দাঁতের ডাক্তারেরা যেমন প্রত্যেক পেশেন্টের হিস্ট্রি কার্ড রাখতেন, আমাদের প্রত্যেক ক্লায়েন্টেরও সেই রকম রেকর্ড রাখতেন। এখন তো কমপিউটার এসে গেছে। ক্যাটালগিং এরও অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। প্রত্যেক ক্লায়েন্টের সব রেকর্ডস আছে আমাদের কাছে। জায়গা বাঁচানোর জন্যে, যদিও মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়। যে-সব ক্লায়েন্ট গত পঁচিশ বছর আমাদের দিয়ে কোনও কাজ করান না, বা ওঁদের রেকর্ডস রাখার আর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না, সে সব রেকর্ডস আমরা নষ্ট করে দিই। দেখি গিরিধারী পারিজার কাগজপত্র আছে কি নেই? ওর পি এ হর্ষদের কাছে ইনস্ট্র্যাকশানস নিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে হর্ষদের মোবাইল ফোন বাজলো। কে ফোন করলেন বোঝা গেল না, তবে হর্ষদের মুখ লজ্জামাখা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মনে হল। তারপর বলল; মাই গ্রান্ডফাদার ওয়ান্টস টু টক ট্যু য়্যু। তারপর সিনিয়র প্রাণিগ্রাহী তোমার সম্বন্ধে ও জেঠুমণির সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। জেঠুমণি যে অনেক বছর আগে চলে গিয়েছেন, তা উনি জানেন। বললেন, য়্যু মাস্ট পে মি আ ভিজিট ইয়াং লেডি। রোথো সাব টেলস মি দ্যাট আই উইল মিস সামথিং ইফ আই ডোন্ট মিট য়্যু। আই অ্যাম ওনলি নাইন্টি ফোর। দো আই হ্যাভ মেনি মোর ইয়ারস টু লিভ, আই ওয়ান্ট টু হেসসেন দ্যা মিটিং। বলেই বললেন, হোয়াই ডোন্ট টু কাম ওভার ফর লাঞ্চ টুডে ইটসেল্‌ফ?

—তুই কি বললি?

তিতির বলল, বললাম, মু চেষ্টা করিবি। ইয়াড়ে কাম্ব সারি যিব তো

নিশ্চয় যিবি, কিন্তু খাইবা পিবাকি কিছি প্রয়োজন নাস্তি। মু আপনাংকু গোড় ছুঁইকি পলাইবি। সম্বলপুর ফিরিবাকু হেব্ব যে।

—একটু একটু ওড়িয়া জানি জেনে বৃদ্ধ খুবই খুশি হলেন, বললেন, আরে ঝিও তুতো ওড়িয়া জানিচি। মা কটকচণ্ডী তমে এটি পঠাইলা। তমুক এটি নিশ্চয়ই করিকি আসিবাকু হেব্ব, মু কিচ্ছি শুনিবনি। বুঝিলু।

—হঁ আইজ্ঞা। কাম্ব সারিলে অবশ্য যাবি। আমি বললাম, তিতির বলল।

—তারপর তাঁর নাতির সঙ্গে কি সব কথা বললেন। ফোন সুইচড অফ করে হর্ষদ বলল, রোথো সাহেবের সঙ্গে দাদুর কি কথা হয়েছে জানি না। তবে যদি আপনার কাজ সত্যিই হয়ে যায়, যাবেন একবার। এত বয়স হয়েছে। গিরিধারী পারিজা এবং আপনার ঋজুদার জেঠুমণির চেয়ে বয়সে উনি অনেকেই বড়।

তারপর বললাম—আশ্চর্য। গলাতে এখনও যথেষ্ট তারুণ্য আছে।

—কিন্তু তা ঠিক। তবে মানুষের মনটাই তো সব। শরীর কিছুই নয়।

আমি বললাম, ও ঋজুদা, আমি যে শ্যামের বাঁশি শুনতে পাচ্ছি।

ঋজুদা বলল, তিতির আগে কাজ কি এগোল সেটা বল। তারপর পাণিগ্রাহী সাহেব এবং তার ক্যারিসম্যাটিক নাতির কথা শুনবো।

তিতির লজ্জা পেলে ওর কমলা রঙা মুখটা পোস্ট অফিস রেড হয়ে যায়। তাই হল। ও বলল, তোমার অনুমান প্রায় একশভাগ কাররেক্ট।

—কি রকম?

প্রথম উইলের দু'জন এগজিক্যুটর ছিলেন। উইল সিনিয়র পাণিগ্রাহী সাহেবই করে দিয়েছিলেন।

—কে কে ছিলেন এগজিক্যুটর।

—তুমি যা বলেছ। বিশ্বল সাহেব আর ঐ গাছ চাপা পড়ে মরে যাওয়ার জঙ্গলের ঠিকাদার বন্ধু গিরিধারীবাবুর।

—কোডিসিল ছিল?

ঋজুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তিতিরের মুখে।

—ছিল।

—কবে করা হয়েছিল?

—তুমি যা অনুমান করেছিলে। গিরিধারীবাবুর অ্যালঝাইমারে আক্রান্ত হবার ঠিক আগে।

—কোডিসিল এর এগজিক্যুটর কে কে ছিলেন?

—বিশ্বল সাহেব এবং...

—এবং কে। আমি বললাম।

—খোঁড়াক্ষণু। তিতির বলল।

ঋজুদা এক আশ্চর্য নিরুত্তাপ গলাতে বলল, তাই?

তারপর বলল, তাহলে কোডিসিল এর কথাটা এই দু'জনে চেপে গেল কেন বেমালুম? কোডিসিল-এ তো গিরিধারী পারিজা তাঁর স্ত্রী এবং বড় ছেলে ছোট ছেলের প্রতি উইলে যে অবিচার করেছিলেন, তারই প্রতিবিধান করেছিলেন। কোডিসিল চেপে যাওয়ার পেছনে খোঁড়াক্ষণুর স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বলের কি স্বার্থ থাকতে পারে? তার নিজের বোনকে সে তাঁর ভগ্নীপতির সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে কি ভাবে লাভবান হতে পারে?

আমি বললাম, পারে। তুমিই তো বলছিলে যে উনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোল ওয়াশারি প্ল্যান্ট করবেন। তাতে তো অনেক টাকার দরকার। মেজোকর্তাও হয়তো সেই ওয়াশারি প্ল্যান্ট এর পার্টনার হবেন। মেজোকর্তা, মা এবং দুই ভাইকে বঞ্চিত করে নিজেই সব সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলে তাতে বিশ্বল এবং খোঁড়াক্ষণুরই লাভ। অন্য এগজিক্যুটরের মৃত্যুতে বিশ্বল একমাত্র এগজিক্যুটর হিসেবে উইলটাকে এগজিক্যুট করলেই এদের সকলের স্বার্থ পালিত হবে। তাই করা কোডিসিল-এর কথা চেপে যাওয়ার জন্যে এদের দু'জনকে মোটা টাকাও হয়তো দিয়েছেন বা দেবেন মেজোকর্তা। তবে খোঁড়াক্ষণু যেভাবে মেজোকর্তাকে দু'হাতে দুয়ে চলেছে, তাতে মেজোকর্তা নিজেই হয়তো একদিন রক্তশূন্য হয়ে যাবেন। তখন তাঁর মৃতদেহের উপরে দুই শকুনের মতো বসে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করবে এরা।

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, বিশ্বল মানুষটা যে এত নিচ, আমার কোনও ধারণা ছিল না। আজকাল শিক্ষিত মানুষেরাই দেখছি সবচেয়ে বড় চোর হয়।

তিতির বলল, উইলের প্রবেটও নিয়েছেন বিশ্বল সাহেব। অথচ কোডিসিলটা দিনের আলো দেখল না। হর্ষদ পাণিগ্রাহী বলেছেন যে, কোডিসিলটাও গিরিধারীবাবু ওঁদের দিয়েই করিয়েছিলেন। ওরিজিনালটা গিরিধারীবাবুর কাছেই ছিল, কিন্তু ওঁদের কাছে ফোটোকপি আছে। কিন্তু প্রবেট নেবার সময়ে কোডিসিল-এর উল্লেখ করা হয়নি, তাই গিরিধারীবাবুর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল।

—কোডিসিল-এ প্রথম উইলের উল্লেখ তো থাকার কথা।

ঋজুদা বলল। উল্লেখ তো ছিলই, কিন্তু এগজিক্যুটর বিশ্বল সাহেব প্রথম উইলেরই প্রবেট নিয়েছিলেন, যার ফলে মেজোকর্তাই সব সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলেন—কোডিসিলটি দিনের আলোই দেখতে পেল না।

আমি বললাম, তাহলে? এখন এর কোনও প্রতিকার নেই?

—প্রতিকার হয়তো আছে অম্বাবতী, সনাবাবুর উত্তরাধিকারীরা, মানে স্ত্রী এবং মেয়ে, ফুচকুবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে ঐ কোডিসিলের ভিত্তিতে কি আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন, না পারেন তা উকিল ব্যারিস্টারেরাই ঠিক করতে পারেন। আইনি কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেন কি না তা পাণিগ্রাহী কোম্পানি, সলিসিটর্সরাই বলতে পারেন। সিনিয়র পাণগ্রাহী এখনও বেঁচে আছেন, এই যা ভরসা। সম্ভবত, উইটনেস হিসেবে কোডিসিল-এ ওঁর সইও থাকতে পারে। ওঁরা কোর্টে যদি যেতে পারেন তাহলে সিনিয়র পাণিগ্রাহীর সাক্ষ্য কোর্টে খুবই কাজে লাগতে পারে হয়তো। ঋজুদা বলল।

—তা হয়তো পারে কিন্তু তার মূল্য কি একটু বেশি পড়ে যাবে না?

—কি রকম?

ঋজুদা বলল।

—তিতিরের সঙ্গে হর্ষদের বিয়ে দিতে হবে যে। বুড়োর যা পছন্দ

হয়েছে তিতিরকে নাত-বৌ না করে কি উনি এত বড় উপকারটা করবেন?

তিতির হাঁউ-মাঁউ করে উঠল। বলল, মরে গেলেও না। আমার পড়াশোনা শেষ হতে এখনও পাঁচ বছর বাকি আছে। হর্ষদ তো ওয়েল-সেটেলড। দাদু কবে মরে যায় তার ঠিক নেই। তাই দাদু, তার বিয়েটা তাড়াতাড়িই সারবেন হয়তো। তাছাড়া ওড়িশাতে সুন্দরী, বিদুষী এবং বড়লোকের মেয়ের কি অভাব পড়েছে, যে তার আমাকে না হলে চলবে না?

ঋজুদা, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, সে তো হর্ষদই জানে। হর্ষদও তো তোর প্রেমে পড়েছে মনে হচ্ছে, শুধু তার দাদু আর রোথো সাহেবই পড়েননি। এটা তো তাঁদের আর তিতিরেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তিতির রেগে বলল, ভাল হবে না কিন্তু। তুমি কি চাও রুদ্র যে ঋজুদা অ্যান্ড কোম্পানি লিকুইডেটেড হয়ে যাক? আমরা আর কোনও অ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দাগিরি করবো না?

—তাতো নিশ্চয়ই না। তাছাড়া তিতিরের মা-বাবাও তো আছেন। আমরা তো ওর গার্জেন নই। এই ব্যাপারে আমাদের নাক না গলানোই ভাল তবে আমার কর্তব্য হবে তিতিরের মা বাবার ঠিকানা ও ফোন নম্বর সিনিয়ার পাণিগ্রাহীকে দিয়ে দেওয়া। তার পরে বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া ছাড়া আমাদের আর কি করণীয় থাকতে পারে।

আমি বললাম।

তিতির বলল, তোমরা এরকম করলে আমি কাল সকালেই ট্যাক্সি নিয়ে ঝাড়সুগুদাতে চলে যাবো—সেখান থেকে সোজা কলকাতা চলে যাবো।

ঋজুদা বলল, সেই ডিসিশানটা দু'একদিন পরেই নিস। কাল সকালে ভটকাইচন্দ্র ফিরুক। আমার মন বলছে সনাবাবু এবং ফুচকুবাবুর স্ত্রী এবং বড় মেয়েদের নিয়ে আমাদের কালই একবার কটক যেতে হবে। অম্বাদেবীকে তো বিশ্বলের অনুমতি ছাড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না। তবে কোর্টে গেলে ওঁকেও পার্টি করবেন ওঁরা নিশ্চয়ই।

—কোডিসিলও তো উইলেরই মতো। গোপন দলিল নয় কি সেটাও?

—না। উইলও গোপন দলিল নয়, সেই অর্থে। তাই কোডিসিলও নয়। তাছাড়া কোডিসিল এর কথা গোপন করে উইলের প্রবেট নেওয়াটা—বিশেষ করে একজন যখন উইল এবং কোডিসিলেরও কমন এগজিক্যুটর, তখন তা সম্ভবত আইনের চোখে অপরাধও। কারণ তাতে অনেকের স্বার্থই বিঘ্নিত হয়েছে। আমরা সলিসিটর্স ফার্ম এর সঙ্গে ওঁদের আলাপ করিয়ে দেবো তারপর এটা ওঁদেরই ব্যাপার। বাইরের লোক আমরা আর কি করতে পারি!

তারপর বলল, তিতির, তোর কাছে হর্ষদের মোবাইল নাম্বার আছে?

—আছে।

—তুই ওকে ডেভালপমেন্টটা জানিয়ে রাখ। আর বলে রাখ, কালকেই লাঞ্চের পরে আমরা ওঁদের নিয়ে কটকে যেতে পারি। তারপর ওরা সাজেস্ট করলে, পুলিশকেও ইনফর্ম করে রাখা দরকার। বামরার থানা মেজোকর্তার কেনা। ইনফর্ম করলে সম্বলপুরকে অথবা বামরার উপরে যে আই জি'র জুরিসডিকশান, তাঁকে ইনফর্ম করতে হবে। যা ডিসিশান নেবার, তা কালকেই নিতে হবে। অম্বাবতীর বুক ভেঙে যাবে এই খবরে। তাঁর নিজের দাদাই যে তাঁর সর্বনাশের মূলে, তা জানার পরে একেবারে ভেঙে পড়বেন উনি। তারপর বলল, যা, তোরা শুয়ে পড়। অনেকটাই ধকল গেছে তোদের। আমিও শোবো। সারাটা দিন একা একা বোর হয়ে গিয়েছি।

ভটকাই বারুঙ্গা আর ফাটা রহমানের সঙ্গে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এসে হাজির হল।

আমরা ওদের ঋজুদার ঘরেই ডেকে নিলাম। নিচের বসার ঘরে না বসাই ভাল। দেওয়ালেরও কান আছে। তাছাড়া এখানের বাবুর্চি বেয়ারারা বিশ্বল সাহেবের বশংবদও।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল ভটকাইকে, তুই কি জানলি বল?

ভটকাই বলল, অনেক কিছুই জানলাম। ফাটা রহমান তো সনাবাবু গুলিবিদ্ধ হবার পরে গাছে চড়ে বসেছিল, তুমি তো একথা জানোই। বারুঙ্গা দৌড়ে বামরাতে খবর দিতে চলে যাবার একটু পরই মানুষের গলার স্বরে ফাটা রহমান চমকে উঠলো। তারপরই অবাক হয়ে দেখল যে উল্টোদিক থেকে খোঁড়াক্ষণু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। তার আগে আগে বন্দুক হাতে ধানু খড়িয়া। খোঁড়াক্ষণু বাটা কোম্পানির অ্যাম্বাসাডর জুতো পরেছিল। সে জুতোর দাগ সনাবাবুর দেহের কাছে বারুঙ্গা দেখতে

পেয়েছিল।

ধানু খড়িয়া? সে আবার কে? মঞ্চে রোজ রোজ নতুন চরিত্রের আগমনে তো দিশেহারা। বাটার অ্যাম্বাসডর জুতোর ছাপ দেখেই বারুঙ্গা চিনে ফেলল?

চিনব না। কত দিনের সখ ছিল এক জোড়া জুতো কেনার, তা আর হল কোথায়? এ-জীবনে হবে না।

—ধানু খড়িয়াও ফাটারই মতো একজন চোরা-শিকারী। তাকে দিয়েই খোঁড়াক্ষণু সনাবাবুকে মারিয়েছিল। খুনী সবসময়েই খুনের জায়গাতে ফিরে আসে—তাই বোধহয় ওরা শিয়োর হতে এসেছিল যে ধনাবাবু মরেছেন কি না! নিশ্চয়ই গুলিটা করেই তারা দু'জনে পালিয়েছিল। দাঁতাল শুয়োরটাকে গুলি করে সনাবাবু যখন পাথরটার উপরে বসে বিশ্রাম করছিলেন, তখন ওরা দু'জনে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। খোঁড়াক্ষণু তার খুবই চেনা। তারা যে তাঁকে খুন করতে আসতে পারে একথা তার মনেই হয়নি। মনে হওয়া উচিত ছিল। বোঝা যাচ্ছে মানুষটা সিম্পল ছিলেন।

—তারপর ফাটা বলল, কি কথা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। তবে খোঁড়াক্ষণুর পাশ কাটিয়ে ধনাবাবুর সামনে এসে ধানু খড়িয়া তাঁর কপালে গুলি করার পরই দু'জনে পালিয়ে যায়। গিয়ে কাছেই কোথাও লুকিয়ে থাকে। তারপর আমার আর বারুঙ্গার গলার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর এবং বারুঙ্গা দৌড়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ওরা দেখতে আসে ধনাবাবু সত্যিই মরেছেন কি না। বলাই বাহুল্য যে, যেহেতু ওরা দূরের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, গাছে চড়তে দেখেনি ওরা কেউই। দেখলে ওরা অকুস্থলে ফিরে আসত না অবশ্যই। খোঁড়াক্ষণু একটি খাকি রঙা প্যান্ট ও খাকি হাওয়াই শার্ট পরে ছিলেন। পায়ে ছিল বাটার অ্যাম্বাসডর জুতো। বললামই তো, ভাবখানা এমন, যেন ওঁরাও শিকারেই এসেছেন। সনাবাবু নিশ্চয়ই ওদের দাঁতাল শুয়োরটার কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ওটি আহত হয়েছে। কিন্তু খোঁড়াক্ষণু তো শুয়োর মারতে আসেনি। এসেছিল

সনাবাবুকেই মারতে। ধনা খড়িয়ার হাতে ছিল খোঁড়াক্ষণুরই বন্দুক। ধনার বন্দুক আমি চিনি। তার একটি বে-পাশী মুঙ্গেরী বন্দুক ছিল। এইরকম ভাল বিলিতি দোনলা বন্দুক সে কোথায় পাবে?

—তারপর?

—তারপর ওরা সনাবাবু যে মারা গিয়েছেন সে সম্বন্ধে শিয়োর হয়েই ফিরে গিয়েছিল। খোঁড়াক্ষণু খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়চ্ছিল, বালির উপর দিয়ে। সে দৌড় দেখে হাসি সামলানো মুশকিল হচ্ছিল আমার। অনেকটা হায়নার দৌড়ের মতো। হায়নার পেছনের পা দুটো তো ছোট হয়।

—ওরা এসেছিল কিসে করে?

—কিসে আবার। গাড়িতেই। খোঁড়াক্ষণুর গাড়ি ছিলই, তবে চড়তো না। ওদের গাড়িটা সম্ভবত নদীর ব্রিজের অন্য দিকে রেখেছিল। গাড়িও চালিয়ে এসেছিল ধানুই। ও ভাল গাড়ি চালায়। খোঁড়াক্ষণুর গাড়ি থাকলেও সে নিজে চালাতে পারে না।

—তারপর?

—ওরা একটা মারাত্মক ভুল করে। খোঁড়াক্ষণুর বন্দুকের গুলির ফাঁকা কার্তুজটা সনাবাবুর বন্দুকের পাশেই ফেলে যায়—যাতে লোকে ভাবে যে সনাবাবু আত্মহত্যা করেছেন। নিজের বন্দুক দিয়ে।

—সেই ফাঁকা কার্তুজ এবং সনাবাবুর বন্দুক পুলিশ নিশ্চয়ই নিয়ে গিয়েছিল। ঋজুদা বলল।

—নিয়ে ছিলই তো এবং সেই বন্দুক এবং ফাঁকা কার্তুজটি এখনও থানাতেই আছে। পুলিশ ভেবেছিল এটা একটি আত্মহত্যার কেস এ কথা প্রমাণ করার জন্য ঐ গুলি ও বন্দুক তাদের সাহায্য করবে।

—তারপর?

—সনাবাবু শুয়োরকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের ব্রিচ খোলাতে সেই গুলিটা ইজেক্টেড হয়ে জঙ্গলেরই কোথাও ছিটকে গিয়ে পড়ে থাকবে। যেহেতু বাঁ ব্যারেলে এল জি ছিলো, উনি ডান ব্যারেলে আর গুলি রি-লোড

করেননি। এই অবস্থায় উনি যখন পাথরের উপরে বসে বিশ্রাম করছিলেন, তখনই ওঁরা এসে ওঁকে কপালে গুলি করে কিন্তু যে ফাঁকা কার্তুজটি ধানু ইচ্ছে করে সনাবাবুর পাশে ফেলে যায়। সেটি খোঁড়াক্ষণুর গ্রিনার বন্দুকের গুলি। ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে গুলির ক্যাপে যে স্ট্রাইকিং-পিন এর দাগ পড়েছে, তা খোঁড়াক্ষণুর বন্দুকের স্ট্রাইকিং পিন-এর থেকে আলাদা।

ঋজুদা বলল, হুম-ম-ম-ম।

তারপর বলল, কিন্তু খোঁড়াক্ষণু জানলেন কি করে যে সনাবাবুরা শিকারে যাবেন ভোরে।

বারুঙ্গা বলল, এই খবর পেয়েছিলেন ওঁরা সনাবাবুর ড্রাইভার মঙ্গলার কাছ থেকে। খোঁড়াক্ষণু প্রতিমাসে তাকে মোটা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছিলো। সনাবাবুর সব খবরই রোজ পাচার করত সে খোঁড়াক্ষণুর কাছে।

—মঙ্গলা কি এখনও সনাবাবুর গাড়িই চালায়?

—সনাবাবু তো নেই, এখন বড়বৌদির গাড়ি চালায়। নিশ্চয়ই তাঁর সব খবরাখরবই এখনও পাচার করে। তবে সেই ব্যক্তিগত গাড়ি তো এই মাসেই কোম্পানিতে চলে যাবে। বড়বাবু না কি অম্বা মা এবং বড় বা ছোটবৌদিকে কোনও সম্পত্তিই দিয়ে যায়নি। তাই ওঁদের তিনজনের গাড়িই চলে যাবে এ মাসের শেষে কোম্পানির হেপাজতে। বৌদিরাও গিয়ে থাকবেন যার যার বাপের বাড়ি। অম্বা মা তাঁর দাদা বিশ্বল সাহেবের কাছে এবং বড়বৌদি, ছোটবৌদি চলে যাবেন দশপাল্লাতে আর বৌধ-এ ওদের বাপের বাড়িতে।

—অম্বাদেবীর গাড়ির ড্রাইভার এখন কোথায়?

—এখনও সে অম্বা মায়ের গাড়ি চালায়। এখন তো আছে সম্বলপুরে। এ মাসের শেষে কোম্পানিরই কোনও অন্য গাড়ি চালাবে হয়তো।

—হুম-ম-ম।

ঋজুদা বলল।

ফাটা রহমান মানুষটা ওরিজিনাল। একটা খাকি হাফ শার্ট পরা, সামনে দুটি বুক পকেট আর সবুজ আর লাল খোপ খোপ একটা লুঙি। মুখে সব সময় পান থাকে, জর্দা দেওয়া। গালের বাঁ দিকটাতে পোঁটলা করা থাকে পান সব সময়ে। ছোট্টখাট্টো মানুষটি, নামনি আসামের আবু সাত্তারের মতো—চওড়া চোয়াল, দুটি তীক্ষ্ণ চোখ এবং মুখের মধ্যে আশ্চর্য এক ভাব—তাচ্ছিল্য এবং বিদ্রুপ মেশা। এই বিদ্রুপ হয়তো কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নয়, হয়তো এই সমাজেরই প্রতি।

—তোমরা কিছু খাবে?

—না না, আমরা পথে খেয়ে এসেছি স্যর।

ঋজুদা আমাদের দিকে চেয়ে বলল, কি রে? আইনের অবমাননার নীরব দর্শক হবি, না আইন নিজের হাতে নিবি?

—প্রয়োজনে, যে-দেশে আইন বড়লোকদের বা ক্ষমতাবানদের দেখার তামাসা মাত্র, সে দেশে আইন নিজেদের হাতেই নিতে হবে।

আমি বললাম, আমরা তো আগেও নিয়েছি কয়েকবার।

ঋজুদা বলল, যা-কিছু করতে হবে তা কিন্তু বামরার পুলিশকে একেবারেই অন্ধকারে রেখে। বামরার পুলিশ নিজেদের বেচে দিয়েছে পারিজাদের মেজোকর্তার কাছে।

তারপর বারুঙ্গা আর ফাটা রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমাদের যদি একটা গাড়ি দিই আর আমার এই দুই চেলাকে, তোমরা কি ক্ষণু ঘোষ, ধানু খড়িয়া এবং মঙ্গলাকে তুলে নিয়ে আসতে পারো?

—কোথায়?

না, না, এই বাংলোতে নয়। তোমরা কাল যে ভাঙা বনবাংলোতে রাত কাটালে, যেখানে না কি পেত্নি আছে, সেখানে নিয়ে আসতে পারো?

বারুঙ্গা বলল, পারলে ক্ষণুখোঁড়াকে আমি গুন্ডি দিয়ে চিবিয়ে খাই। ওকে ভাল করে শিক্ষা দিতে পারলে পরদিন আমি আত্মহত্যা করে মরে যাবো।

বারুঙ্গার আবার জীবনের দাম কি? আপনারা একটু মদত দিলেই হয়।

—দিনের আলোতে কাজটা মুশকিলের হবে। তোমরা সন্ধের মুখে মুখে বামরা চলে যাও।

বলেই ভটকাইকে বলল, সম্বলপুর থেকে একটা টাটা সুমো বা স্করপিও ভাড়া করে নে। ড্রাইভার নিবি না। দু'দিনের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দিবি, আর ওরা অচেনা লোকদের ভাড়া দিতে না চাইলে নিজেদের ক্রেডিট কার্ড আই-ডি হিসেবে ব্যবহার করবি। ওদের নিয়ে অন্ধকারের পরে ঐ বাংলোতে চলে যাবি। আমি অন্য একটি গাড়ি নিয়ে মেধেশ্বরের মন্দিরের রাস্তাতে ঢুকে যাব। আমাকে মন্দিরের ডিরেকশানটা দিয়ে দিবি।

—মন্দির অবধি যেতে হবে না। তার আগেই বাঁদিকে একটা 'সুঁড়ি' পথ আছে। গাড়ি যায়। বর্ষা আরও প্রবল হলে হয়তো যাবে না। এখন অনায়াসে চলে যাবে, সেই পথ দিয়ে ঢুকবে।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, সম্বলপুর থেকে দুটো পাতলা কম্বল কিনে নেব আর ঝিকার ডাল ভেঙে নেব?

—এখানে ঝিকার ডাল কোথায় পাবে?

জঙ্গলে গাছ আছে কয়েকটা। আমি দেখে এসেছি। তবে ঝিকা তো বলে উত্তরবঙ্গে, এখানে বলে চিরুঙ্গা।

—ঐ ডাল পেলে তো ভালই। মনের সুখে কম্বল চাপা দিয়ে মারলে দাগ পড়বে না। নিজের পিস্তল, একস্ট্রা ম্যাগাজিন এবং টেপ রেকর্ডার এবং একস্ট্রা ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেটও নিবি।

—নেব। ভটকাই বলল।

—ইনিশিয়েটিভ তুই-ই নিবি বটে কিন্তু অপারেশনের লিডার হবে রুদ্রই।

—তা তো জানিই। এ জীবনে কো-পাইলট হয়েই কাটাতে হবে, ক্যাপ্টেন আর হওয়া হবে না।

ঋজুদা পার্স খুলে ফাটা রহমান ও বারুঙ্গাকে একটা করে পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে বলল, তোমাদের ভটকাই বাজারে ছেড়ে দিয়ে আসবে। সন্ধের মুখে মুখে রাঁদেভু পয়েন্ট-এ ওরা আসবে। সেই পয়েন্টটা নিজেরাই ঠিক করে ওদের বলি দিবি। তোমরা খাওয়া দাওয়া করে বাজারে গিয়ে সন্ধে অবধি অপেক্ষা করবে। দুটি গাড়ি একসঙ্গে যাবে না। আধ কিমি মতো দূরত্বে যাবে।

তারপর বারুঙ্গাকে বলল, আপনার আর ফাটাবাবুর বন্দুক নিয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বন্দুক তো কাল থেকেই সঙ্গে আছে। গাড়িতেই আছে।

ফাটা রহমান বলল, যে ফাটা সে আবার বাবু হয় কি করে স্যর? আমাকে বাবু বলে লজ্জা দেবেন না। বাবু মানেই আস্ত।

ভটকাই বলল, আজকে আস্ত বাবু খোঁড়াক্ষণুকে ফাটাবো আমরা।

বারুঙ্গা মজা পেয়ে হেসে উঠলো সে কথাতে।

আমি বললাম, গাড়ি ঠিক করে বাজারে ওঁদের ছেড়ে দিয়ে আমরা কি এখানে ফিরে আসব?

—আয়।

তারপর ভটকাই এর দিকে ফিরে ঋজুদা বলল, কাল ভটকাই এর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট গিয়েছে, দুপুরে কি খাবি না খাবি বাবুর্চিকে বলে দিবি।

ভটকাই বলল, যা রান্না হবে তাই খাবো। আমি চিরদিনই স্কেপগোট হব না।

ঋজুদা হেসে বলল, তাই?

তিতির বলল, আমার কি কাজ?

—ওরা চলে যাক। তারপর বলছি সব বুঝিয়ে। তোরই তো আসল কাজ। তুই-ই তো গন্ধমাদন পর্যন্ত বয়ে বিশল্যকরণী আনবি—অম্বাবতী আর দুই বৌমাকে বাঁচাতে।

তারপর বলল, আমার মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। বারুঙ্গাকে এখন

তিতিরের সঙ্গে যেতে হবে—বামরাতে, বড়বৌমা আর ছোটবৌমাকে নিয়ে আসতে। তিতিরকে তো তাঁরা চেনেন না। অচেনা মানুষের সঙ্গে ওঁরা আসবেন কেন? দাঁড়া, আগে, বিশ্বলের বাড়িতে অম্বাবতীকে একটা ফোন করে বলি যে বড়বৌমা ও ছোটবৌমাকে বলে রাখতে যে তাঁরা তৈরি হয়ে থাকেন যেন, তিতির আর বারুঙ্গা যাচ্ছে। একথাও বলতে হবে যে রাতে ফিরতে অনেক দেরি হবে। তিতির ওঁদের তুলে অম্বাবতীকে নিয়ে চলে যাবে কটকে। অনেকখানি রাস্তা। সকলকেই কিছু খেয়ে নিতেও বলতে হবে। দুপুরে খাওয়ার সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। এও বলতে হবে যে রাতে ফেরা নাও হতে পারে।

মোবাইল-এ ফোন করল ঋজুদা বিশ্বলের বাড়িতে। অম্বাবতীকে বলল, আপনার স্বামী গিরিধারীবাবু আর বড়বৌমা ও ছোটবৌমার উপরে যে অন্যায় হয়েছে, তার একটা প্রতিবিধানের পথ হয়তো হতে পারে। কিন্তু তিতিরের সঙ্গে দুই বৌমাকে নিয়ে আপনার একবার আজই কটকে যেতে হবে। রওনা হতে হবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। তিতির গাড়ি নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছে দু'বৌমাকে নিয়ে। দু'জনকেই আপনি ফোনে একটু বলে রাখবেন এখুনি তৈরি হয়ে থাকতে। ওঁরা তো তিতিরকে চেনেন না। মিসেস বিশ্বলও আপনার প্রকৃত হিতার্থী। ওঁকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। উনি সঙ্গে থাকলে আপনাদেরই ভাল।

তারপর বলল, বিশ্বল আজ ফিরবে কখন?

—আজ ফিরবে না! ভুবনেশ্বরে চেয়ারম্যানকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে যাবে—কাল সকালে ফিরবে!

—তাহলে তো একদিক দিয়ে ভালই। যদি ওখানে থেকে যেতে না হয় তবে আপনারা, খুব দেরি হলেও, মনে হয় রাত এগারোটার মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন। বাড়িতে সে কথা বলে যাবেন। তবে কোথায় এবং কাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তা আপনার দাদাকে, মানে বিশ্বলকে, বলার এখুনি দরকার নেই। সময় খুবই কম। পথে তিতির আপনাদের সব বুঝিয়ে দেবে। আমরা

তো এখানে চিরদিন থাকতে পারব না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। প্লিজ, আনলেস য়্যু হেল্‌প ইওরসেলভস, য়্যু আর আনডান। ঠিক আছে?

বলেই, মোবাইল ফোনের স্যুইচ অফ করে দিলো।

তারপর বলল, তিতির তুই বারুঙ্গাকে নিয়ে চলে যা। ফিরে এসে বারুঙ্গার তো আবার যেতে হবে বামরাতে সন্ধেবেলাতে।

আর ধনদ পাণিগ্রাহীকে ফোনে বলে রাখ, কাগজপত্র যদি কিছু সই করতে হয় ওঁদের, তবে সে সব একেবারে তৈরি করে রাখতে। কারণ, কাজ সেরেই তো ফিরতে হবে ওঁদের সম্বলপুরে।

—কিছু খেয়েও যা।

—না, ব্রেকফাস্ট তো খেয়েছি, আর কিছু খেতে হবে না।

—তবে যা, দেরি করিস না। যাও ভাই গাদু। গাদু বলল, "আলো শুকিলা সাড়ু মন মরি গলা দ্বিপাহারু।"

তিতির চলে গেলে আমি বললাম, প্ল্যানিংটা খুব স্কেচি হয়ে গেল না! এতগুলো ইফ্‌স অ্যান্ড বাটস এর উপর নির্ভর করে সব কিছু করা, যদি একটা প্ল্যানও ফেঁসে যায়, তবে তো পুরো কাঠামোই ধ্বসে পড়বে।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল, ধ্বসতে পারে। আবার নাও পারে। ইনসাল্লা। সব ঠিকঠাক এগজিক্যুটেড হলে গিরিধারীবাবুর উইলের এগজিক্যুটর বিশ্বল মশাই এমন বেকায়দাতে পড়বেন; যে তা বলার নয়। মেজোকর্তার জারিজুরিও সব বৃথা হবে। তবে তিতিরের, বারুঙ্গার এবং ফাটা রহমানের কাছে সব জানার পরে কিছু না করে বসে। তাহলে তিন তিনজন অসহায় পথে-বসানো বিধবাকেও তো বাঁচানো যাবে না। এটা আর প্রফেশনাল অ্যাসাইনমেন্ট নেই, একটা মরাল অবলিগেশান হয়ে গিয়েছে। এটা না করে এবং এই ক্যালকুলেটেড রিস্কসগুলো না নিয়েও আমাদের উপায় নেই। কাজটা না করলে অবিবেচকের কাজ হবে। এর পর কখনও

সম্বলপুরে এলে আর এদের আতিথেয়তাতে থাকা কখনওই সম্ভব হবে না। তবে এখানে আসার আর কোনও প্রয়োজনও হয়তো হবে না। অম্বাবতী এবং তাঁর বড় ও ছোটবৌমাকে কটকেইকোথাও থাকতে হবে হয়তো কিছুদিন, মামলা লড়ার কারণে। সেটার বন্দোবস্ত পাণিগ্রাহী সাহেবরাই করে দিতে পারবেন। ঈশ্বরের দয়ায় পাণিগ্রাহীরা ভাল উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়ে যদি ঐ কোডিসিল এর ব্যাপারে একটা কিছু করতে পারেন, ক্ষতিগ্রস্ত পার্টিরা মিলিত দরখাস্ত করে এবং কোর্টে মুভ করে, তাহলে সব কিছুরই সুরাহা হয়তো হয়ে যাবে। দ্যাখ, MAN PROPOSES, GOD DISPOSES! ওঁরা তিনজনই স্বমহিমাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। ওঁরা যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হন, তাহলে ক্ষতি ওঁদেরই। আমাদের কি? আমরাও কালই ঝাড়সুগুদা হয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে পারি।

আমি বললাম, তা কি আর পারবে? একটা থিয়েটার দেখেছিলাম, তাতে একজন কমেডিয়ান মাথায় পাগড়ি-পরা ব্যবসায়ীর ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের ব্যবসা ছিল আটা কলের। তাঁর পার্টনার আটার সঙ্গে তেঁতুলের বিচির গুঁড়ো মিশিয়ে অনেক মুনাফা করতে চাইছিলেন। সেই ব্যবসায়ী স্টেজে একা দাঁড়িয়ে স্বগতোক্তি করছিলেন, "এই বিবেক শালা হারামজাদা আছে। শালা কিছুতেই মানতেছে না।"

ঋজুদা বলল, সেই হচ্ছে কথা। বিবেক সত্যিই হারামজাদা। আমাকে আর ক'টাকা ফিস দেবেন এঁরা। কিন্তু যা আমরা করছি, তা তো বিবেকেরই তাড়নাতে।

সন্ধে নামতে না নামতেই আমি আর বারুঙ্গা পারিজা কোম্পানির হেড অফিস থেকে একটু দূরে একটা ঝুপড়ি বড় গাছে নিচে গাড়ি লাগিয়ে কাঁচ তুলে বসে থাকলাম। গাড়িতে টিন্টেড কাঁচ ছিল, তাই বাইরে থেকে আমাদের দেখা যাচ্ছিল না। দেখা যাচ্ছিল সামনের কাঁচ দিয়ে। বারুঙ্গা মাথা নিচু করে বসেছিল। আর আমাকে তো এখানে কেউই চেনে না, আমাকে কেউ দেখলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। রাস্তাঘাট ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

এদিকটা এমনিতেই ফাঁকা। একেক করে গোটা পাঁচেক গাড়ি অফিসের কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে গেল। তার মধ্যে একটি ব্যালেনো গাড়ি ছিল। বারুঙ্গা বলল, মেজোকর্তাও বেরিয়ে গেলেন। এরপর খোঁড়াক্ষণু বেরোবে। সোয়া সাতটা নাগাদ খোঁড়াক্ষণু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরলো। তারপর অফিসের গেটের কাছের একটি চিনাবাদামের দোকান থেকে চিনাবাদাম কিনে চিনাবাদাম খেতে খেতে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপরে আমাদের গাড়ির কাছে আসতেই বারুঙ্গা দরজা খুলে নেমে তার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে বললো, নমস্কার আঁইজ্ঞা।

—তমে এটি কন করিচু?

বলল, খোঁড়াক্ষণু।

বলতেই বারুঙ্গা তাকে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে গাড়ির খোলা দরজার দিকে টেনে নিলো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে তাকে গাড়ির পেছনের সিটে ঢুকিয়ে দিলাম। বিপদের আশঙ্কাতে খোঁড়াক্ষণু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই কোমরের হলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে তার পেটে নলটা ঠেকিয়ে দিয়ে বললাম, ডোন্ট শাউট। ইফ য়্যু ডোন্ট বিহেভ, আই উইল শ্যুট য়্যু। তাতেই ক্ষণজন্মা ঠাণ্ডা মেরে গেল। বলল, হোয়াট আর উ্য আপ টু?

—য়্যু উইল সি।

কর্কশ স্বরে বললাম আমি।

তারপরই স্টিয়ারিং-এ বসে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। ততক্ষণে ফাটা রহমান পেছনেরর সিট এ শুইয়ে রাখা তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে খোঁড়াক্ষণুকে পায়ের কাছে শুইয়ে ফেলে তার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে নিজের পা দুটো তার উপরে উঠিয়ে দিয়ে বলল, পাট্টি করিবে তো প্রাণ যীবে।

মেঠেশ্বরের মন্দিরের কাছে আসতেই বারুঙ্গা একটি সুঁড়ি পথ দেখিয়ে সেই পথে গাড়ি ঢোকাতে বলল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক কিমি মতো গিয়েই দেখতে পেলাম সামনে একটা জরাজীর্ণ বাংলো। সেই বন-

বাংলোর সামনে আরও একটি গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। বুঝলাম যে, ভটকাই এর গাড়ি। বাংলোতে পৌঁছে খোঁড়াক্ষণুকে পিছে বন্দুক ঠেকিয়ে বারুঙ্গা সেই বাংলোর মধ্যে নিয়ে চলল। ভিতরে মোমবাতির আলো জ্বলছিল। দেখলাম, ভটকাই হাতে পায়ে দড়ি-বাঁধা গুণ্ডামতো একজন লোকের সামনে বন্দুক বাগিয়ে বসে আছে আর ফাটা তার পাশে দাঁড়িয়ে। ফাটার সামনে মাটিতে তার মুখখোলা পাৎলা প্লাসটিকের ব্যাগটা মেঝেতে রাখা আছে। বুঝলাম যে তাতে তার টেপ-রেকর্ডারটি আছে। আমিও আমার কাঁধ থেকে আমার ব্যাগটি নামিয়ে চেইন খুলে অন্য দিকে রাখলাম। ফাটা রহমান আর বারুঙ্গা ঝটপট খোঁড়াক্ষণুর হাত-পাও বেঁধে ফেলল।

মিনিট দশেকের মধ্যে ঋজুদাও একটি বোলেরো জিপ চালিয়ে এসে পড়ল। আমাদের দু'জনকে এবং ঋজুদাকে এই মূর্তিতে দেখে খোঁড়াক্ষণু একেবারে মিইয়ে গেল। তুতলে বলল, কি করতে চান আপনারা?

ঋজুদা বলল, কিছু প্রশ্ন করতে চাই। ঠিক মতো জবাব না দিলে এখানেই হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই আপনার ও আপনার সঙ্গীর লাশ পড়ে থাকবে। দশ পনেরো দিনের আগে কেউ জানতেও পারবে না।

তারপর ধানু খড়িয়ার দিকে ফিরে বলল, এই ধানু খড়িয়া?

ফাটা রহমান বলল, হ্যাঁ।

—তুমি সনাবাবুকে গুলি করেছিলে কপালে?

—না বাবু। আমি গরীব মানুষ। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে একটু আধটু শিকার করে, শিকারের জানোয়ারের মাংস আর চামড়া বিক্রি করে কোনওক্রমে সংসার চালাই। আমি কেন অত বড় মানুষকে গুলি করতে যাব?

—হুম-ম-ম।

ঋজুদা বলল।

তারপর খোঁড়াক্ষণুকে বলল, গুলিটা কি ধানু আপনার বন্দুক দিয়েই করেছিল। তাই না?

—কি বলছেন স্যার আপনি? উনি, মানে সনাবাবু তো আত্মহত্যা করেছিলেন?

—তাই বুঝি? আপনি কি জানেন যে প্রত্যেক বন্দুকের স্ট্রাইকিং-পিন একরকম হয় না? সনাবাবুর বন্দুকের পাশে যে কার্তুজের খোলটা ফেলে রেখেছিলেন, সেই গুলি তো হয়েছিলো আপনার বন্দুক থেকেই। সনাবাবুর বন্দুকের ডান ব্যারেলের গুলি তো ধানু বের করে নিয়েছিল। বামরার পুলিশ একে আত্মহত্যা বলে মেনে নিলেও সম্বলপুরের পুলিশ এবং ভুবনেশ্বরের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট তা মানবে না। সনাবাবুর বন্দুক এবং তাঁর মৃতদেহের কাছে যে গুলির খোল পড়েছিল, তা তো জমা আছে থানাতে। তা পরীক্ষা করলেই বেরিয়ে পড়বে আসল তথ্য। তাছাড়া, সনাবাবুর বন্দুকের বাঁদিকের ব্যারেলে ছিল অ্যালফামাক্স-এর এল. জি। তার মানে তাঁর ডানদিকের ব্যারেল থেকে অ্যালফাম্যাক্স-এর বল দিয়েই সম্ভবত তিনি দাঁতাল শুয়োরটাকে গুলি করেছিলেন। গুলি করেছিলেন অন্য জায়গাতে। গুলি করার পরে শুয়োরের পেছন পেছন কিছু দূর গিয়ে মোটা মানুষ আর যেতে না পেরে ঐ পাথরে বসে পড়েছিলেন। অথচ, যে ফাঁকা কার্তুজের ভিত্তিতে উনি আত্মহত্যা করেছিলেন বলছেন আপনি এবং বামরার পুলিশ, সে তো ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স কোম্পানির কার্তুজ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনার কিছু বলার আছে?

—খোঁড়াক্ষণু বলল, আমার কি বলার থাকতে পারে। গুলি তো আমি করিনি। আপনারাই তো বলছেন যে গুলি করেছিল ধানু খড়িয়া!

—সে তো বটেই! চিরদিনই তো বড়লোকে এমনি করেই গরীবদের ফাঁসিয়ে এসেছে। বন্দুকও আপনার, গুলিও আপনার, ধানু খড়িয়ার তো অত ভাল বন্দুক নেই। তার তো মুঙ্গেরী বন্দুক। তার বন্দুকের স্ট্রাইকিং-পিন পরীক্ষা করলেও বোঝা যাবে যে ঐ গুলিটি তার বন্দুক দিয়ে করা হয়নি। কত টাকা দিয়েছিলেন সনাবাবুকে মারবার জন্যে আপনি? পাঁচ হাজার না দশ হাজার?

এমন সময় ধানু খড়িয়া তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, তাহলেও না বোঝা যেত বাবু। দিয়েছিলেন তো মাত্র পাঁচশটা টাকা। তাও দু'কিস্তিতে।

ঋজুদা বলল, তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে, তুমিই মেরেছিলে সনাবাবুকে।

নিজের কলে আটকে পড়ে কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ধানু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, গুলিটা হয়তো আমিই করেছিলাম, কিন্তু সনাবাবু মানুষ ভাল ছিলেন—ওঁর সঙ্গে আমার কোনও বিবাদও ছিল না। আসলে তো ওঁকে মারিয়েছিলেন মেজোকর্তা আর ক্ষণুবাবু।

—মেজোকর্তারও হাত ছিল বুঝি এর পেছনে।

—আরে, উনিই তো আসল লোক। বড়বাবুর সব সম্পত্তি মেনে নিয়ে বড় ভাই ও ছোট ভাইকে, নিজের মাকেও সর্বস্বান্ত করেও সাধ মিটল না। ভাইদের প্রাণেও মারলেন। আর তাঁর ডান হাত হচ্ছেন এই ক্ষণুবাবু। তবে মেজোকর্তা তো জানেন না এই মানুষটি কি চরিত্রের। একদিন মেজোবাবুকে সরিয়ে দিয়ে এই নেপোই পারিজা কোম্পানির সর্বেসর্বা হবে। মেজোকর্তা নিজেকে খুব চালাক মনে করেন, কিন্তু আসলে মানুষটা খুবই বোকা। নইলে আপন মানুষদের পর করে এই বাইরের একটা বাজে লোককে মাথায় চড়ান।

ভটকাই বলল, এরা পরকে আপন করে, আপনাকে পর। রবিঠাকুর কি এমনি এমনি অমন গান বেঁধেছিলেন।

—তুমি এত কথা জানলে কোথা থেকে ধানু? ঋজুদা বলল।

—আমি একা কেন? বামরার সব মানুষই এ কথা জানে। জিজ্ঞেস করে দেখবেন? কে না জানে!

—সনাবাবুকে তো তোমাকে দিয়ে গুলি করানো হল। তোমার তো ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবেই। কিন্তু তুমি সব সত্যি কথা বললে তোমার শাস্তি একটু কমতেও পারে। কিন্তু ফুচকুবাবুকেও মেজোকর্তা মারলেন এ কথা বলছ কেন?

ধানু ততক্ষণে বেপরোয়া হয়ে গেছে তার ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবে। সে রেগে বলল, এই খোঁড়াকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন? মেজোকর্তা তো এরই বুদ্ধিতে ওঠেন বসেন।

—ফুচকুবাবুর মৃত্যুর কথা বলো?

—ফুচকুবাবুর তো ব্রেইন-ম্যালোরি হয়েছিল। সিমলিপালে ছবি তুলতে গিয়ে মশার কামড় খেয়ে ঐ অসুখ বাঁধিয়েছিলেন। আমিও তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি। ঐ ফাটাও তো ঘোরে। আমার আর ফাটারও দু'দুবার হয়েছিল দু'জঙ্গলে গিয়ে। আমার হয়েছিল একবার লবঙ্গীতে গিয়ে আরেকবার রেঙ্গানি-কানিতে গিয়ে। দু'দুবারই সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় আমার বৌ। তাই বেঁচে যাই। ফাটার কোথায় গিয়ে হয়েছিল তা ফাটাই বলতে পারবে। কিন্তু তাকেও তার বড় ভাই সঙ্গে সঙ্গে সম্বলপুরের হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়াতে সেও বেঁচে যায়। আর অত বড়লোকের ছেলে ফুচকুবাবু, তাকে এই বামরাতে ফেলে রাখাটা খুন করা নয়। তখন তো সনাবাবু মারাই গেছেন। মেজোকর্তা আর এই খোঁড়াক্ষণু গুজগুজ ফুসফুস করে এখানের শ্রীপতি ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে এখানেই বাড়িতে রেখে নার্স-টার্স এর শো করে মারলো এরা ফুচকুবাবুকে। এই কথাও বামরার সক্কলে জানে। আপনি বামরার পথেঘাটে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই একথা বলবে। আরও বলবে, কারণ ফুচকুবাবু মানুষ বড় ভাল ছিলেন। গরীবদের প্রতি খুব দরদ ছিল। বড়লোক বলে কোনও চাল-চালিয়াতি ছিল না। ওঁর মৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্মাহত।

তারপর ক্ষণু ঘোষের দিকে চেয়ে বলল, যার বুকে একটিও চুল নেই সে মানুষ কখনও ভাল হতে পারে স্যর?

খোঁড়াক্ষণু বললেন, আমিও তো গবীর মানুষ। বিয়ে-থা করিনি। একবেলা খাই। তাও নিরামিষ। টাকা-পয়সার উপরে আমার কোনও লোভই নেই। আমার কি দরকার বড়লোকের পরিবারের মধ্যের এইসব রাজনীতির মধ্যে যাওয়ার?

আমি বললাম, বড্ডই গরীব আপনি, না? চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে হেঁটে বাড়ি যান, গাড়ি থাকতেও। আপনার মতো এত বড় হিপোক্রিট সম্ভবত কমই হয়েছে পৃথিবীতে।

খুব গরম দেখিয়ে খোঁড়াক্ষণু বললেন, কি জানেন আপনি আমার সম্বন্ধে?

—যা জানি, তার সব বললে আপনি এখুনি হার্টফেল করবেন। একটা মিনি পেপার মিল-এ কত ইনভেস্টমেন্ট লাগতে পারে? দু'টো স-মিল। অতবড় কাঠের ব্যবসা। ব্যাচেলর আপনার ছেলে মারুতি গাড়ি চালিয়ে র‍্যাভেনস কলেজে পড়তে যায় কটকের মঙ্গলাবাদ থেকে। আপনার স্ত্রী আর ভায়েদের নামে আর কি ব্যবসা আছে আপনার? সকলের লকারেই বা কত নগদ টাকা আর গয়নাগাঁটি আছে? বছরে পনেরো দিন ছুটি নিয়ে ব্যাচেলর, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, প্রায়-সন্ন্যাসী আপনি সারা ভারতে তীর্থ করতে যান, এই জানে বামরার সকলে, এমনকি মেজোকর্তাও! আসলে আপনি কোথায় যান, কি করেন, তা একটু একটু জেনেছি আমি। তবে আপনার সুখের দিন শেষ। পুলিশ সনাবাবুর হত্যার জন্যে আপনাকে জেলে দেবে আর ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আপনার সাজানো বাগান শুকিয়ে দিল বলে। তার সব বন্দোবস্তই সম্পূর্ণ করে রেখেছেন ঋজুবাবু।

—এসব কি বলছেন আপনি।

আতঙ্কিত গলাতে বললেন ক্ষণু ঘোষ।

আমি বললাম, যা বলছি তা সবই যে সত্যি তা আপনি ভাল করেই জানেন। আপনার মাথা-মোটা, ওপর-চালাক, সর্বজ্ঞ মেজোকর্তাও শিগগিরি আপনার সম্বন্ধে সব জেনে হার্ট-ফেল করবেন।

তারপরই বললাম, গিরিধারী পারিজার উইল এর কথা সকলেই জানেন। উইল তো কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্ট নয়। সেই উইলের জোরেই তো বড়কর্তা, ছোটকর্তা এবং তাঁদের মাকেও পথে বসিয়েছেন আপনারা। বিশ্বল সাহেব উইলের এগজিকুটর ছিলেন। অন্যজন তো রহস্যজনকভাবে

গাছ-চাপা পড়ে মারা গেলেন বড়বাবুর মৃত্যুর আগেই। গিরিধারীবাবু যে কোডিসিলটি করেছিলেন, তার কথা শুধু জানতেন বিশ্বল সাহেব, মেজোকর্তা এবং আপনি। সেই তথ্যটা চেপে যাওয়ার জন্য আপনি আর বিশ্বল সাহেব মেজোকর্তার কাছ থেকে কত লাখ বা কোটি মেরেছেন? আপনার পেপার মিলের টাকা বা বিশ্বল সাহেবের কোলওয়াশারি প্লান্ট এর টাকা কি তা থেকেই এসেছে?

—সে তো ব্যাঙ্কের টাকা।

—ব্যাঙ্ক তো লোন দেবে। কিন্তু সিড ক্যাপিটাল? সেটা কোত্থেকে আসবে? পেপার মিল বা কোল ওয়াশারি প্ল্যান্ট করতে যা সিড ক্যাপিটাল লাগে, আপনার বৈকালিক খাদ্য চিনাবাদাম নয়!

খোঁড়াক্ষণুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

হঠাৎ তিনি বললেন, আপনাদের কপালে দুঃখ আছে। বিশ্বল সাহেব আর মেজোকর্তার অতিথি হয়ে এসে তাঁদেরই পেছনে লেগে গিয়েছেন?

ঋজুদা বলল, তাঁদের পেছনে লাগিনি। আপনারা অম্বাবতী দেবী, এবং সনাবাবু এবং ফুচকুবাবুর স্ত্রী ও মেয়েদের যে পথের ভিখারি করে দিয়েছেন, তার প্রতিকার কিছু করা যায় কি না তাই দেখছি। যে সন্তান নিজের মা, নিজের দাদা-বৌদি ছোট ভাই-ভাদ্রবৌ এবং তাদের মেয়েদের এভাবে বঞ্চিত করে আপনার ও বিশ্বল সাহেবের মতো মানুষদের বড়লোক করেন, তাঁকে তো শিক্ষা একটু দিতেই হয়। জানেন ত পুববাংলাতে একটি প্রবাদ আছে, "জন, জামাই, ভাগ্না, কভু না হয় আপনা"। দেখা যাচ্ছে প্রবাদটি যথার্থ।

—জন মানে?

—এই জন সাহেব নন। JOHN নন। জন অর্থাৎ কাজের লোক অর্থাৎ আপনি আদৌ আপন হলেন না এই পারিজা পরিবারের।

বলেই বলল, ক'টা বাজেরে ভটকাই?

—প্রায় ন'টা।

—এবার চল ফেরা যাক।

তারপর বলল, গিরিধারী একটি গর্হিত অন্যায় করেছিলেন। এই যুগে শুধুমাত্র মেয়ে বলেই তারা তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে এমন ভাবনা কোনও শিক্ষিত মানুষ ভাবতে পারেন, তা কল্পনাই করা যায় না। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, অবশ্য এ কথা ঠিক যে উনি জানবেন কি করে যে বড় ও ছোট ছেলের একটিও পুত্রসন্তান হবে না। তবে এই ভুল উনি বুঝতে পেরেই কোডিসিলটি করেছিলেন। মেজোকর্তা যদি মানুষ ভাল হতেন তবে বাবার এই ভুল নিজেই সংশোধন করে নিতেন। উইলের বেনিফিসিয়ারি ইচ্ছে করলেই অন্য ভাইদেরও সমান অংশ দিতে পারতেন—বঞ্চিতা মাকে তো অবশ্যই দিতে পারতেন।

তারপর পাইপে দু'টান দিয়ে বলল, কিন্তু শুধু নিজেই পুত্রসন্তানের জনক বলে এ যুগে এইভাবে মা ও ভায়েদের বঞ্চিত করার কথা ভাবলেও ঘেন্না হয়। কিন্তু মেজোকর্তার চেয়েও বড় পাপী আপনি আর আমার পরিচিত, উচ্চশিক্ষিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্বল সাহেব। আপনি না হয় একজন পেডিগ্রি-হীন non-entity—আপনার মতো ছাতার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এখন ব্যাঙের ছাতার মতো পথপাশে দেখা যায়। আপনার শুভাশুভ বোধ নিয়ে কোনও উচ্চ ধারণা আমার নেই। আপনাদের মতো মানুষেই এখন পৃথিবী ছেয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বলের ব্যাপারটা আমাকে বড় ব্যথিত করেছে।

তারপর ঋজুদা আমাদের দিকে চেয়ে বলল, তোদের টেপ রেকর্ডারগুলো এবারে বন্ধ কর। এ থেকে সি. ডি. করে ইনকাম ট্যাক্সের চিফ সি আই টি-ওয়ান সুভাষ সেন সাহেবকে একটি এবং ডিজিপি নন্দন মিশ্রকে একটি পাঠাতে হবে। চল, এবার ওঠা যাক।

ক্ষণু ঘোষ বলতে যাচ্ছিলেন, এক মাঘে শীত যায় না। কিন্তু টেপ রেকর্ডারের কথা শুনেই নিজের কথা নিজে গিলে ফেললেন।

—তাহলে আমরা উঠলাম।

ক্ষণু ঘোষ কাতর কণ্ঠে বললেন, আর আমরা?

—আপ্পনমানে কন করিবে, বসিকি চিনাবাদাম খাউন্তু, "আলো শুকিলা সাড়ু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু।"

—আপনারা পেত্নীর কোম্পানিতে থাকবেন সারা রাত। বৃষ্টিও পড়া শুরু হয়েছে কুরুবকের বনে। মোমবাতিগুলোও প্রায় নিভে এল। দারুণই রোম্যান্টিক ব্যাপার। আপনি তো ব্যাচেলর। দেখুন মেধেশ্বরের জঙ্গলের পেত্নীর সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার যদি করতে পারেন। সঙ্গে আপনার বডিগার্ড ধানু খড়িয়া তো রইলই। ও তো শুনেছি, শুধু হাতেই একটি চিতা-বাঘিনী মেরেছিল। একটা পেত্নীকে কি মারতে পারবে না। আমি বললাম।

ভটকাই বলল, ডোন্ট ওয়ারি। সকাল হলেই প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকবেন। যদি কেউ শুনে আপনাদের বাঁধন খুলে দেয় তো মুক্ত হয়ে যাবেন। ম্যাক্সিমাম দিন সাতেক এরকমভাবে থাকতে হতে পারে।

ঋজুদা বলল, স্যরি, আপনাদের ফেলে যেতাম না। কিন্তু পাণিগ্রাহী কোম্পানির উকিল ব্যারিস্টারেরা অম্বাবতী দেবী এবং বড় ও ছোট বৌমার কোডিসিল সংক্রান্ত পিটিশান যতক্ষণ না প্রপার কোর্টে পেশ করছে, ততক্ষণ আপনারা যাতে ঝামেলা না করতে পারেন, তারই বন্দোবস্ত এটি। বিশ্বলের বন্দোবস্তও করছি একটা, সে কাল ভুবনেশ্বর থেকে ফিরলেই।

বলেই বলল, কিরে রুদ্র, ক্ষণজন্মা ঘোষের পকেট সার্চ করে মোবাইল ফোনটা তো নিয়ে নিবি। আচ্ছা, কেয়ারলেস তো তুই।

আমি বললাম, স্যরি। ভুলে গিয়েছিলাম।

ভটকাই বলল, তিনজন মহিলার অনেক অভিশাপ আছে আপনার উপরে। এই শাস্তিটা আপনার প্রাপ্য ছিল। আপনি যাঁর মন্ত্রদাতা সেই মেজোকর্তা ডুববেন স্বখাত সলিলেই।

দরজা অবধি গিয়ে ঋজুদা বলল, আপনাকে বলা হয়নি, কটকের পাণিগ্রাহী কোম্পানির অফিসে কোডিসিলটি পাওয়া গেছে। তাতে উইটনেস হিসেবে সিনিয়র পাণিগ্রাহীর সইও আছে। প্রয়োজনে তিনি নিজে

কোর্টে অ্যাপিয়ারও করবেন বলেছেন। গিরিধারী পারিজার বিশেষ বন্ধু ছিলেন উনি। যদিও বয়সে অনেকেই বড়।

আমি বললাম, এদের ক'টা মিনারাল ওয়াটারের বোতল দিয়ে গেলে হতো না? জলতেষ্টাতে মারা যাবে যে!

ঋজুদা কঠোর গলাতে বলল, না। নিরম্বু উপবাস কাকে বলে তা বিধবারা জানেন। তিন-তিনজন বিধবা ওঁদেরই জন্যে অনেকদিন নিরম্বু উপবাস করেছেন। ওঁরা একটু সাফার করুন। এসব ব্যাপারে কোনও হৃদয়দৌর্বল্যর মানে হয় না। শাস্তি দিয়ে চকোলেট খাওয়াবার মানে হয় না। কত বড় অপরাধ ওঁরা করেছেন, তা একটু বুঝুন ওঁরা। ফাঁসি থেকে বাঁচলেও রিগরাস ইমপ্রিজনমেন্ট হলেও তো মজাটা বুঝবেনই।

ভটকাই বলল, এঁদের চেঁচানিতে যদি কোনও লোক চলে আসেন?

—মেধেশ্বরের মন্দিরের কোনও তীর্থযাত্রী? এদের মুখগুলোতে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে যাই? তোর রুমালটাও দে তো রুদ্র।

বলেই, আমার কাছ থেকে আমার রুমালটা নিয়ে আর ওর রুমালটা জোর করে ওদের মুখ হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ওদের দু'জনের চোখই বিস্ফারিত হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, চল এবার।

ভটকাই বলল, টা-টা, বাই-বাই।

বাইরে বেরিয়ে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ঋজুদা বলল, আমি আর ভটকাই এগোচ্ছি। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপিয়ে। রুদ্র, তুই বারুঙ্গা আর ফাটা রহমানকে যার যার বাড়িতে পৌঁছে দে। আমরা বাজারে থাকব সম্বলপুরে। গাড়ি দুটো ফেরৎ দিয়ে একটা লোকাল-ট্যাক্সি নিয়ে ডিরেক্টরস বাংলোতে ফিরে যাব।

আমি বললাম, এদের দু'জনকেই কিছুদিনের জন্যে অন্য কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করে গেলে ভাল হত না ঋজুদা? ওরা কোনওক্রমে ছাড়া পেলে ওরা আর মেজোকর্তা মিলে এদের তো ছিঁড়ে

খাবে।

---সেটা ঠিক বলেছিস।

তারপর বারুঙ্গাকে জিজ্ঞেস করল ঋজুদা, দিন দশেকের জন্যে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে তোমরা? তোমাদেরই স্বার্থে।

বারুঙ্গা বলল, সুন্দরগড়ে গিয়ে থাকতে পারি আমার এক মাউসার বাড়িতে।

ফাটা বলল, আমারও এক মাওলা অর্থাৎ মামা আছে দশপাল্লাতে। সেখানে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি।

---তবে তাই যাও তোমরা। এখন আমাদের সঙ্গেই চল তোমরা সম্বলপুর অবধি। আর এই নাও পাঁচ হাজার টাকা রাখো। সম্বলপুরেই রাতটা কোনও হোটেলে কাটিয়েই ভোরের বাসে চলে যাবে দু'জনে। আর কটকের পাণিগ্রাহী কোম্পানির ধনদ পাণিগ্রাহীর ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বারও তোমাদের দিয়ে দেব। কালই ফোন করে তোমাদের ঠিকানা ওঁকে জানিয়ে দেবে। উনি যখন ডাকবেন তখনই কটকে দিয়ে দেখা করবে ওঁর সঙ্গে। তোমাদের সাক্ষ্য ওঁর দরকার হবে।

তারপর বলল, টাকাটা আমি দিচ্ছি এখন। কেস জিততে পারলে ওঁরা আমাকে এ টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবেন। আমার ফিস এর সঙ্গে তোমাদেরও যেন কিছু ফিস দেন তাও আমি দেখব। তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমরা তো কিছুই করতে পারতাম না। অনেকেই ধন্যবাদ তোমাদের।

---আর যদি ওঁরা কেসে হেরে যান?

---তবে টাকাটা আমার পকেটে থেকেই যাবে। আমার টাকার কথা ছেড়ে দাও। হেরে গেলে তোমাদের তো বামরা ছেড়ে অন্য জায়গাতেই গিয়ে চিরদিন থাকতে হবে। এরা তো তোমাদের ছিঁড়ে খাবে নইলে। খুনও করিয়ে দিতে পারে। তবে কেস-এ হারার সম্ভাবনা প্রায় নেই-ই বলা চলে।

---তাহলে তাই চলুন।

কুরুবকের বনে বৃষ্টি নেমেছে। সুগন্ধ উঠছে দু'ধারের বৃষ্টি ভেজা বন

থেকে কাঁচা রাস্তা থেকে। ঘোর রজনী।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, এখন সবই নির্ভর করছে তিতিরের পারফরমেন্সের উপরে। ওর মিশন যদি সাকসেসফুল হয়, তবেই কেল্লা ফতে হবে।

—তা তো হবে। কিন্তু হর্ষদকে নিয়ে তো এক বড় সমস্যা হবে। এখন তো মনে হচ্ছে আমার আর রুদ্রর তো তাকে গিয়ে গুলি করে মারতে হবে। এত সহজে তো আমরা আমাদের পার্টনার তিতিরকে পরহস্তগত ধন করতে দিতে পারি না।

—হর্ষদকে যদি তিতিরের মনে ধরে যায় তাহলে তোরা কি করতে পারিস?

—এত কঠিন কঠিন রহস্য ভেদ করলাম আর একটি হর্ষদ বধ করতে পারব না?

ভটকাই ফাইনাল স্টেটমেন্ট শেষ করল।

ভটকাই-এর কথাতে আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল ভটকাইকে, তোকে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়লাম—এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

আমরা যখন গাড়িতে উঠলাম তখন প্রায় ন'টা বাজে রাত। আমি, ঋজুদা আর ফাটা রহমান এক গাড়িতে, আর অন্য গাড়িতে ভটকাই আর বারুঙ্গা।

ঋজুদা বলল, এক সময়ে এইসব জঙ্গলে অনেক জানোয়ার ছিল, না? ফাটা?

—জানোয়ার এখনও আছে, তবে জঙ্গলে কমই দেখা যায়। তারা সব ছোট-বড় শহরে চলে এসেছে।

আমরা হেসে উঠলাম।

—তুমি নাকি গুণ্ডা হাতিও মেরেছ?

—হ্যাঁ, স্যর। কটক ভুবনেশ্বরের সম্বলপুরের নামীদামী শিকারীরাও

ইস্তফা দেওয়ার পরে ডি এম সাহেব, আমি যে চোরা শিকার করি তা জানা সত্ত্বেও আমাকে ডেকে ঐ আপদের হাত থেকে মানুষ জন গরু-বয়েল, ঘর-বাড়ি বাঁচাবার বরাত দেন।

—তোমার বন্দুক দিয়েই মারলে অত বড় হাতিকে?

—না স্যর। মালখানাতে নিয়ে গিয়ে আমাকে অস্ত্র পছন্দ করতে বলেছিলেন। আমি একটা ফোর সেভেন্টি ফাইভ ডবল-ব্যারেল রাইফেল পছন্দ করলাম। রাইফেলটির সঙ্গে নতুন গুলিও ছিল। এক রাজা মারা যাবার পর মালখানাতে জমা পড়েছিল। তাঁর তোষাখানার জিনিস। কয়েকদিনের জন্যে আমিও মহারাজা হয়ে গিয়েছিলাম।

—একদিন তোমার মুখ থেকে শুনব সেই গুণ্ডা হাতি শিকারের গল্প।

—আমার সৌভাগ্য স্যর। শোনাব আপনাকে।

—যে দাঁতাল শুয়োরটাকে সনাবাবু গুলি করেছিলেন সেটাকে কি পরে মারতে পেরেছিলে?

—মিথ্যা বলব না স্যর। সেদিন তো প্রাণ নিয়ে সটকেছিলাম—শুয়োরের ভয়ে নয়, সনাবাবুকে খুন করার দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে। তবে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পরে, তার পরদিন বিকেলে এসেছিলাম একা। রক্তের দাগ দেখে দেখে প্রায় আধ মাইলটাক গিয়ে পেলাম শুয়োরকে। তখনও জবরদস্ত আছে তবে রক্তক্ষয় হতে হতে খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তবুও আমাকে দেখেই তেড়ে এল কুরুবকের ঘন আস্তরণ ভেদ করে। আমিও বন্দুক তুলে দেগে দিলাম। পড়ে গেল তখন দুর্বল দাঁতাল। আমি আর বেশি ঝুঁকি নিলাম না। দাঁত দুটি কেটে আর সামনের একটি রাং কেটে নিয়ে গদার মতো কাঁধে ফেলে গভীর রাতের অন্ধকারে ফিরে এলাম। সনাবাবুর জন্যে বড় দুঃখ হল—বারার মাংস খেতে বড় ভালবাসতেন সনাবাবু। তবে রান্না করে গাদুবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম পরদিন রাতে। দু'জনে পানমৌরির সঙ্গে খেয়েছিলাম।

—শুয়োরকে বুঝি ওড়িয়াতে বারা বলে?

—হ্যাঁ, ঋজুদা বলল।

আমরা যখন কিরেই এর মোড়ে এসে পৌঁছেছি, তখন ঋজুদার মোবাইল বাজলো।

—এতক্ষণ কি অফ করে রেখেছিলে?

—হ্যাঁ। কেন? তোরা করিসনি?

—ও আমরাও তো করেছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম 'অন' করতে।

ঋজুদা বলল, বল তিতির? কত দূর কি করতে পারলি?...ওয়ান্ডারফুল! আমি জানতাম। তুই একটা উইজার্ড। তাছাড়া তোর সুন্দর মুখই যে তোর ভিজিটিং কার্ড।

তারপরে বলল, কালই মুভ করবে?

—আমরা সবাই আজ কটকেই থাকব। ওঁরাই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

—তুই সাবধানে থাকিস। কথাটার মানে বুঝেছিস?

তিতির বলল, ঋজুকাকা তুমিও কি ভটকাই হলে? ধনদ কাগজপত্র সব তৈরি করেই রেখেছিল।

—বাঃ! কি বললি? ফাটা রহমান আর গাদু দাসকে নিয়ে যেতে হবে? কাল সকাল ন'টার মধ্যে পাণিগ্রাহীর অফিসে পৌঁছতে হবে? ঠিক আছে। যথা আজ্ঞা।

তারপর সামনের সিট-এ বসে আমার দিকে ফিরে বলল, তবে আর গেস্ট হাউসে ফিরে কাজ নেই। সম্বলপুরে রাতের খাওয়া সেরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে সময়মতো কাল সকালে পাণিগ্রাহীদের অফিসে পৌঁছে যাওয়া যাবে। পথে কোথাও বাথরুম আর ব্রেকফাস্টও সেরে নেওয়া যাবে। চল একটা গাড়ি ছেড়ে দেব এবারে। আমরা চারজন তো কমফর্টেবলি চলে যেতে পারব এক গাড়িতেই। স্করপিওটা রেখে বোলেরোটা ছেড়ে দেব।

—যা ভাল মনে কর।

কটক থেকে ফিরে আমরা আর মহানদী কোল ফিল্ডস-এর গেস্ট হাউসে উঠিনি। সম্বলপুরের সবচেয়ে ভাল হোটেলে রাতটা কাটিয়েছিলাম। কটকে দু'দিন থাকতে হয়েছিল আমাদের সকলকেই। তারপরে অম্বাবতী বড় বৌমার সঙ্গে বড় বৌমার পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন। মামলার তারিখ পড়েছে দশদিন পরে। মেজোকর্তা ও বিশ্বলের কাছে কোর্টের নোটিস চলে গিয়েছে। ফাটা রহমান ও বারুঙ্গা চলে গেছে যার যার গন্তব্যে। দুই বৌমাকে ধনদই গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, নিজেদের গাড়ি, মামলার তারিখের একদিন আগে ফিরে আসতে বলে। আর ছোট বৌমাকে সে নিজেই পৌঁছে দেবার জন্য গিয়েছে। ফুচকুবাবুর স্ত্রী পরমাসুন্দরী। নাম আয়েষা। শিশুকন্যার বয়স মোটে দুই। সেও পরমাসুন্দরী। আয়েষার বাবা খুব নামী ডাক্তার। আয়েষা তাঁর একমাত্র কন্যা। মনে হচ্ছে, এই যাত্রা তিতিরকে হারাতে হারাতে আমরা বেঁচে গেলাম।

তৎকালের টিকিট পেলে ভাল, নইলে আমরা গাড়ি নিয়েই কলকাতাতে

ফিরে যাবো ঠিক করেছি। ঋজুদা বিশ্বল সাহেবকে কটক থেকে একটি চিঠি লিখে ধনদকেই দিয়ে দিয়েছিল ক্যুরিয়ারে সম্বলপুরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। চিঠিতে কি লিখেছিল আমাদের বলেনি। কিন্তু আমরা সকলেই বুঝেছি যে বিশ্বল সাহেবের মতো এমন কৃতবিদ্য মানুষের এইরকম নীচতা ঋজুদার কাছে আদৌ প্রত্যাশার ছিল না। খুবই আহত হয়েছে ঋজুদা।

আমরা কিরেই ছাড়িয়ে এলাম।

তিতির স্বগতোক্তি করল, এদিকে আবার কবে আসা হবে কে জানে!

ঋজুদা বলল, ওড়িশা তো এখন তোরই রাজত্ব। ধনদকে বললেই সে সব বন্দোবস্ত করে দেবে। তাছাড়া কেসটির ফয়সালা হয়ে গেলে তোরা তো বামরাতেই এসে উঠতে পারিস। অম্বাবতী এবং বড় বৌমা ও ছোট বৌমা তো অকৃতজ্ঞা নন। ওঁরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই তোকে রানীর হালে রাখবেন।

ভটকাই বলল, আমরা সবই করলাম অথচ, মেজোকর্তাকেই চোখে পর্যন্ত দেখলাম না। এরকম কিন্তু আগে কখনওই হয়নি।

—রাবণ বধ করতে হলে রাবণকে যে দেখতেই হবে তার কি মানে আছে? আমরা তো মেঘনাদ-এর মতোই মেঘের আড়াল থেকে মেজোকর্তা-বধ বাণ প্রয়োগ করেছি।

—তবু, মানুষটাকে চোখে দেখার ইচ্ছাটা রয়েই গেল।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, রক্তকরবীর রাজাকে কি দেখা যায়?

তিতির বলল, বিশু পাগল কে? বারুঙ্গা?

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, শুধু বারুঙ্গাই নয়, ফাটা রহমান, ধানু খড়িয়া ওরা প্রত্যেকেই অসাধারণ সব চরিত্র। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে আমাদের কৃতিত্বের কথা এই যে বিশু পাগলকে আমরা মরতে দিইনি।

—নন্দিনীকেও কিন্তু দেখা গেল না।

তিতির বলল।

—জঙ্গল ও জঙ্গলী জানোয়ার সম্বন্ধে ফাটা রহমানের যা জ্ঞান তার ছিটেফোঁটা আমার নেই।

ঋজুদা বলল।

—এটা বিনয়ের কথা হলো। তিতির বলল।

—না রে। ওরা যে জঙ্গলের পোকা। ফাটা রহমান একা নয়, ওর মতো অগণ্য মানুষ আমি দেখেছি। শিশুকাল থেকে যে ওরা জঙ্গলেই বড় হয়েছে। ওদের জানাতে কোনও ফাঁকি নেই। আমাদের জানা তো সৌখিন জানা। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনাই হয় না, হবেও না। জঙ্গল ওদের জীবন, ওদের জীবিকাও বটে, ওদের যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।

ভটকাই বলল, আচ্ছা ঋজুদা, খোঁড়াক্ষণুর কেসটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু তোমার বন্ধু বিশ্বল সাহেবের কেসটা বুঝলাম না।

—আমিও কি বুঝলাম? দিনকাল বদলে গেছে। আজকে শিক্ষা-অশিক্ষা, ভদ্র-অভদ্র, শহুরে বা গ্রাম্য কোনও মানুষকেই কোনও বিশেষ তকমা দেওয়া যায় না। তোর 'সপ্তম রিপু' উপন্যাসে তুই বলতে চেয়েছিস যে ষড়-রিপুর উপরে আজকে সব শ্রেণির মানুষের যশাকাঙক্ষা সত্যিই এক নবতম রিপু হিসেবে সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। তোর এই ভাবনাটা একেবারে APT, যদি বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে গুণমানই পুরস্কারের মাপকাঠি হত, তবে ঐ যুগোপযোগী উপন্যাসের জন্যে তুই অবশ্যই পুরস্কৃত হতিস।

ভটকাই বলল, ছাড়ো তো! ঐসব পুরস্কারের দাম কি? দড়ি টানাটানি করেই তো ওসব বাগানো হয়। আসল পুরস্কার হচ্ছে পাঠকের পুরস্কার। পাঠকের হৃদয়ে যে লেখক জায়গা করে নিতে পারেন, তাঁদের শ্রদ্ধা ভালবাসা পান, তিনিই লেখক। মিডিয়া বা সরকার বাঁশের ডগাতে ঝাণ্ডা বেঁধে তাতে তাঁর নাম লিখে তাঁর বিজয়-কেতন ওড়ালেই তিনি IPSOO-FACTO লেখক হয়ে যান না। ঐ সব কিছুই একদিন প্রহসন বলে ধরা পড়ে। মানুষে তাঁদের নিয়ে হাসাহাসি করে। আর তাতে সেই লেখকদের সম্মান

বাড়ে না।

ঋজুদা বলল, ঠিক বলেছিস ভটকাই।

তিতির বলল, তাছাড়া শ্রদ্ধা ব্যাপারটা তো ভিক্ষা করে পাবার নয়, RESPECT IS TO BE COMMANDED।

ঋজুদা বললো, বিশ্বলের কেসটা সপ্তম রিপুর নয়, দ্বিতীয় রিপুর। প্রয়োজন আর চাহিদার মধ্যে ও গুলিয়ে ফেলেছিল। বার্টান্ড রাসেল তাঁর "THE CONQUEST OF HAPPINESS" বইতে লিখেছিলেন : "WE DO NOT STRUGGLE FOR EXISTANCE, WE STRUGLES TO OUT-SHINE OUR NEIGHBOURS" সব রিপুই আদিম। তাই দ্বিতীয় রিপুও আদিম। মিডিয়া যেভাবে ভোগ্যপণ্যের লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে তাতে মানুষের মনুষ্যত্বই লোপ পেতে বসেছে।

—বিশ্বলের ব্যাপারটাও তাই-ই। ও 'আরও চাই', 'আরও চাই' এর রোগে এমনইভাবে আক্রান্ত হয়েছেযে ওর শুভবোধ, ওর বিবেক, ন্যায়-অন্যায়বোধ সবই তছনছ করেছিল, ও-ও-সেই শটিক্ষেতের মতো তছনছ হয়ে গেছে। ওর মধ্যের সবরকম ভালত্বই জলাঞ্জলি দিয়েছে ও নিজের অজান্তে। ওর সব প্রাপ্তি সব মেধা, সব গুণ বিফলে গেছে।

ভটকাই বলল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, এই একবিংশ শতাব্দীর মানুষদের আসল বিপদ বিন লাদেন নয়, পাকিস্তানের ছদ্মপ্রেম নয়, আমেরিকার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নয়, আসল বিপদ হচ্ছে ওই অন্ধ, অর্থগৃধ্নু সর্বগ্রাসী মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়া, এফ এম রেডিও, টিভি এবং আরও নতুন নতুন কত মিডিয়া। সন্ত্রাসবাদে যদি সামিলই হতে হয় তবে এই মিডিয়ার তাণ্ডবের বিরুদ্ধেই করা উচিত। আমাদের যা কিছু ভাল ছিল ভারতীয়ত্বর, গ্রামীণ ভারতবর্ষের, সব কিছুই চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা আসল শত্রুর খোঁজ না করে অনেক কম ক্ষতিকারক শত্রুদের নিধনের উপরে যোগ দিয়েছি।

ঋজুদা বলল, ভটকাইকে তোরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস না রে। দিনে দিনে

তো ও একজন মহান চিন্তাবিদ হয়ে উঠছে।

ভটকাই বলল, "বাপকা বেটা, সিপাহি কি ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।" তোমার এই সাধুসঙ্গে থেকে নিজেকে যদি একটু উন্নতই না করতে পারলাম, তাহলে আর সাধুসঙ্গ করে লাভ কি?

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। ভটকাই ছাড়া।

তিতির বলল, এখনও মেধেশ্বরের মন্দিরেই কি পড়ে আছে খোঁড়াক্ষণু আর ধানু খড়িয়া।

—কে জানে।

—এবারে তার ফর্সা মাকুন্দ বুকে হয়ত লোম গজাবে।

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, বুকে চুল না থাকলেই পুরুষ খারাপ হয়, এ কথা আমি মানি না।

ভটকাই বলল, কেন? হর্ষদ পাণিগ্রাহীর বুকে বুঝি চুল নেই?

আমরা হেসে উঠলাম।

তিতিরের মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, বাজে কথা বলা তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। উত্তমকুমারের বুকেও তো একটুও লোম ছিল না—উনি কি খারাপ মানুষ ছিলেন?

—কখনোই না। ভটকাই-ই-বলল।

—তবে?

ভটকাই তারপরে বলল, 'EXCEPTION PROVES THE RULE'—কথাটা মিথ্যে হলে এ বিষয়ে হিন্দি কহবৎ থাকত না। ঋজুদার কাছে শুনলে না? "আচায়তানা কহে পুকার, উসসে রহো হুঁশিয়ার, যিসকে ছাতিমে নেহি একোবার।"

আমি বললাম, একটা ব্যাপার আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে রইল, বিশ্বল সাহেবই যদি নাটের গুরু, তাহলে উনিই তোমাকে ডেকে আনলেন কেন?

ঋজুদা বলল, ডেকে আনলেন নিজের ছোটবোনের কাছে প্রমাণ করতে

যে তাঁর ও দুই পুত্রবধূরও দুর্দশার জন্যে তাঁর প্রয়াত স্বামীই দায়ী, আর কেউই নন। উইলেই যে গিরিধারীবাবু তাঁদের সর্বনাশের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, এ কথা তাঁর দাদা এবং মেজোছেলে ছাড়াও ঋজুদার মতো নামী কাউকে দিয়ে বলাতে পারলে বোনের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকবে না—এই ভেবেছিলেন।

—আসলে বিশ্বলের জানা উচিত ছিল যে আমার চেনা-পরিচিতর জগৎটি নেহাৎ ছোট নয়। তাছাড়া জেঠুমণির সঙ্গে একাধিকবার আসাতে গিরিধারীবাবুর ব্যবসার কিছু কথা আমারও কানে আসে। জেঠুমণিকে একজন ডাকসাইটে পেশাদার হিসেবে অনেকেই জানতেন এবং হাতের কাছে পেলে টুকটাক পরামর্শ সকলেই নিয়েও নিতেন।

—তাছাড়া, আমার মনে হয় বিশ্বল ওভার-কনফিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল। মেগালোম্যানিয়াকও বটে। ওর ভাল করতে এসে আমি যে খারাপ করব এমন করে, সে কথা ও দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। পাণিগ্রাহী অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে জেঠুমণির যে পেশাগত সম্পর্কও ছিল; এ কথাও সম্ভবত বিশ্বলের জানা ছিল না।

তারপর বলল, যাই হোক, ভালোর জন্যেই হয়েছে। বিশ্বল তো আর না খেয়ে মরবে না। এমনিতেই তো যথেষ্ট বড়লোক সে। মুশকিলে পড়বে খোঁড়াক্ষণু, ধানু খড়িয়া আর মেজোকর্তাও। তবে CODICIL-টা বেমালুম চেপে যাবার জন্যে কি যে শাস্তি তার হবে, তা আমার জানা নেই। আদৌ হবে কি না, তাও। যদিও মেজোকর্তাই King-Pin—তাঁর বিরুদ্ধে কিভাবে ক্রিমিনাল চার্জ ফ্রেম করবেন, না করবেন—সেটা ধনদ-হর্ষদদের ব্যাপার। তারপর বলল, দুর্দান্ত ছেলেটা কিন্তু। যেরকম স্মার্ট, তেমনই হ্যান্ডসাম। ও না কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি এবং ম্যানেজমেন্টও করেছে। ও সব ডিগ্রী ওর কাজে ওকে অনেকেই সাহায্য করবে। দারুণ।

ভটকাই বলে উঠল, "আলো শুকিলা সাদ্ধু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু"।

তারপরই তিতিরের দিকে ফিরে বলল, কি বলো তিতির?

তিতির কপট অথবা সত্যি রাগই দেখিয়ে নাকি-নাকি সুরে বলল, ভাঁল হঁচ্ছে নাঁ কিঁন্তু।

[এই উপন্যাসের পটভূমি বাস্তব কিন্তু সব চরিত্রই কাল্পনিক। যদি কোনও জীবিত ও মৃত চরিত্রের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোনও চরিত্রর কোনও মিল লক্ষিত হয়, তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও দুর্ঘটনাপ্রসূত বলেই জানতে হবে]